মিলনান্ত

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭.

উৎসর্গ

শ্রীজওয়াহরলাল নেহেরুর

করকমলে—

এই লেখকের ঃ-

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
মনে ছিল আশা
রাত্রির তপস্যা
ভাড়াটে বাড়ী
বহু বিচিত্র
নববধূ
কোলাহল
স্মরণীয় দিন
প্রভাতসূর্য
দুর্ঘটনা
পুরুষ ও রমণী
রজনীগন্ধা
জীবন-স্বপ্ন
প্রেরণা
পৃথিবীর ইতিহাস
নারী ও নিয়তি
সমারোহ
উপকণ্ঠে
গল্প-পঞ্চাশৎ
রক্তকমল
দেহ-দেউল
আকাশলিপি
সোহাগপুরা
বিধিলিপি
রূপ-তরঙ্গিমা
কঠিন মায়া
রাত-মোহানা
সীমান্তরেখা
জ্যোতিষী
ক্লমা ও সেমিকোলন
সাবালক
দুটি
শ্রেষ্ঠ গল্প
মালাচন্দন
আব্ছায়া
জন্মেছি এই দেশে
কলকাতার কাছেই
বহ্নিবন্যা

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সাম্‌লাতে অম্বুর একটু সময় লাগল।

তখন অফিসের সময় হয়ে এসেছে—আর মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে বেরোতে না পারলে কিছুতেই ঠিক সময়ে পৌঁছানো যাবে না—তবু অনিমেষ বিহ্বল-দৃষ্টিতে ওর মায়ের দিকে চেয়ে বসেই রইল। অনেকক্ষণ পরে খানিকটা সম্বিৎ ফিরে আসবার পর বললে, 'ব্যাপার কী বল তো মা? কাকে দেখ্‌তে যাব?'

'জানিনে বাছা!' মা বিরক্ত হয়ে উঠলেন, 'মেয়ে দেখতে যাবে, পাত্রী! ও বাড়ীর ঠাকুরপো যে মেয়েটির কথা বলছিলেন সেদিন, সেই যে ওঁর সেজ মেয়ে লতুর ননদ, তাকে কাল আমি দেখে এসেছি। মেয়ে অবিশ্যি এমন কিছু আহা-মরি নয়—তবে নিন্দেরও নয়, চলনসই। জানা-শুনো ঘর, রংটা ফরসা আছে, কাজে-কর্মেও ভাল, তাছাড়া একেবারে শুধু হাতেও কাজ করবে না। কাল আমি ওদের কথাবার্তার ভাবে যা বুঝলাম, হাজার-খানেক নগদ আর হাজার-দেড়েকের গয়না ওরা দিতে চায়। হয়ত চাপ দিলে আরও কিছু বাড়বে। সব দিক দিয়েই এ সম্বন্ধ ভাল। আমার মোটামুটি পছন্দও হয়েছে। এখন তুমি যদি নিজে একবার দেখে আসতে চাও তো বল, নইলে আমি কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেলি!'

তা বটে, অ[illegible] ভেবে দেখল যে, আপত্তি করবার, প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাবার মত ওর কোন কারণ বা যুক্তি নেই। যে-সব আপত্তি ওর ছিল এতদিন, তার আর কোনটাই এখন টিকবে না। শেষ বোনটারও বিয়ে হয়ে গেছে, চাকরীতে পাকা হয়েছে, সংসার বলতেও এখন ওরা মাত্র দুটি মানুষ।

তবু ও একবার শেষ চেষ্টা করলে, মজ্জমান লোক যেমন ক'রে

পাড়ের ঘাস ধরে বাঁচতে চায় তেমনি ব্যাকুল হয়েই বললে, 'কিন্তু এখনও তো ছোট খুকুর বিয়ের সব দেনা শোধ হয় নি, তা ছাড়া মাথা গোঁজবার একটা জায়গা আজ পর্যন্ত করতে পারলুম না, এরই মধ্যে—'

মায়ের মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। তিনি যেন একটু বেশী রকমের শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'এধারে বয়স কত হ'ল সে খেয়াল আছে কি? এবারে যে সাঁইত্রিশ পেরিয়ে আটত্রিশে পড়লে! ছোট খুকীর বিয়ের দেনা বলতে তো তোমার অফিসে যে টুকু। সে তো আর মাত্র আড়াই শ' টাকা! মাসে-মাসে মাইনে থেকেই শোধ হতে পারবে, নয়ত নগদ যে হাজার টাকা পাব তা থেকেই ফেলে দেওয়া যাবে। বুড়ো বয়সের বিয়ে, ঘটা করবার তো দরকার নেই—বাকি টাকাতেই যা হয় হবে। না হয় গায়ে-হলুদ আর ফুলশয্যে কাটান দেব! বাড়ি করার কথা যদি বল—এতদিন কম মাইনেতে এতবড় সংসার চালিয়ে চার-চারটে বোনের বিয়ে দিতে পারলে আর এখন বেশী মাইনেতে ছোট সংসার চালিয়ে বাড়ি করতে পারবে না? ও সব বাছা তোমার বাজে ওজর, এবার পষ্ট ক'রে বল, বিয়ে করবে কি না—নইলে, না যদি কর তো আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, এ শ্মশান আগলে আমি আর পড়ে থাকতে পারব না!'

আক্রমণটা শুধু আকস্মিক নয়—তীব্রও বটে। অনিমেষ কোন কথারই জবাব দিতে পারলে না—তেমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইল শুধু। অবশেষে যখন একসময় খেয়াল হ'ল যে সাড়ে দশটা বাজবার আর বেশী দেরি নেই তখন যেন জোর ক'রেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ ক'রে নিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'আমি একটু ভেবে দেখি মা, তুমি আজই কিছু কথা দিও না—'

বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলে, মা ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলছেন, 'ভেবে দেখতে দেখতে তো পরমায়ু শেষ হয়ে এল—আর কত ভেবে দেখবে তা জানি না।'

সত্যিই—বয়স যে সাঁইত্রিশ পেরিয়ে আটত্রিশে পড়েছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, ভেবে দেখবার বয়স ওর গেছে—রাস্তা চলতে চলতে এই কথাটাই বার বার অনিমেষের মনে পড়তে লাগল। তথ্যটা যেন ওর মনেই ছিল না, হঠাৎ মায়ের কথায় চম্‌কে উঠেছে অনু। বয়স ওর এত হয়ে গেছে? আশ্চর্য! সময় আর নেই, হয় এখনই বিয়ে করতে হবে, নইলে স্পষ্ট বলে দিতে হবে 'আর করব না'। শিগ্‌গিরই এমন একটা বয়স এসে যাবে ওর, যে বিয়ে করতে চাইলেও আর বিয়ে হবে না। ভাল মেয়ে তো নয়ই, বাজে মেয়েও তখন আর কেউ সহজে দিতে চাইবে না।

অথচ, অত্যন্ত করুণ একটা হাসি অনুর মুখে ফুটে উঠল, ভেবে দেখবার ওর কিছুই নেই। ভেবে দেখেছে সে দীর্ঘদিন ধরে। অনেক আগেই ভেবে রেখেছে। মধ্যবিত্ত ঘরের অধিকাংশ বাঙ্গালী ছেলেই প্রথম বয়সে বিবাহে আপত্তি জানায়, বাপ-মাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হয় বিয়ে দিতে—কিন্তু অনিমেষ 'বিয়ে করব না' এমন কথা একবারও বলে নি, বিয়ের ইচ্ছে ওর মনে এসেছে সতের বছর বয়স থেকেই—তখন থেকে স্বপ্ন দেখেছে ও বিবাহিত জীবনের। ওর যখন আঠার-উনিশ বছর বয়স তখন কলেজের ক্লাসে বসে বসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত, অধ্যাপকদের অনুযোগে বা ধমকে চম্‌কে উঠে ভেবে দেখত যে এতক্ষণ ধরে ও বসে বসে ভাবছিল ওর বৌ কেমন দেখতে হবে। সে ফরসা হবে না কালো, রোগা হবে না মাঝারি—এরই একটা হিসাব মনে মনে ক'রে কোন্‌টা ওর ঠিক পছন্দ বোঝবার চেষ্টা করত। ওর বৌ লাজুক হবে নিশ্চয়ই, আর কিছুটা ঠাণ্ডা মেজাজের। কেমন ক'রে ও তার লাজুক বৌকে ফুলশয্যার রাত্রে কথা কওয়াবে তাই ভাবতে ভাবতে প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্লাসে ওর হাত যেত বন্ধ হয়ে।

কিন্তু সে শুধুই কল্পনা—দিবাস্বপ্ন। থার্ড ইয়ারে উঠতেই ওর

বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। সাধারণ গেরস্ত, একটু নিচুদরেরই কেরানী ছিলেন তিনি, সুতরাং সংস্থান কিছুই ক'রে রেখে যেতে পারেন নি—যা গহনা ওর মায়ের গায়ে ছিল তা বেচে' ছ' মাসও সংসার চলে না। অগত্যা ওকে স্বপ্ন দেখাটা স্থগিত রাখতে হ'ল, চারটি ছোট বোন—সংসার ছোট নয়। খাওয়ানো পরানো শুধু নয়—বিয়ে দিতেও হবে তাদের। পড়াই হয়ত ছেড়ে দিত ও, শুধু ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ক'রে—প্রাণপণে চেষ্টা করবে একটা—মনে মনে স্থির করলে। সকালে আর বিকালে দুটো টিউশানি নিয়ে এবং মায়ের গহনা বেচে কোনমতে ফোর্থ ইয়ারটা চালিয়ে নিলে। কিন্তু বি.এস্-সি পরীক্ষা দিয়ে যখন বেরোল, তখন পেতল-কাঁসার বাসন পর্যন্ত ওদের আর একখানাও নেই—সব কলাই-করা আর মাটির বাসনে ঠেকেছে। অর্থাৎ একবেলা বসে থাকাও আর সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

সুতরাং নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায় নি ও তারপর থেকে একেবারেই। চাকরী বেছে নিয়ে করবার সময় ছিল না বলে সামনে যেটা পেয়েছে সেইটেই নিয়েছে ও—মাইনে সামান্য, উন্নতি সীমাবদ্ধ। শুধু অফিসের বেতনে কুলোয় না, তাই টিউশনিও রাখতে হয়েছে। ফলে সকাল সাড়ে ছ'টার মধ্যে বিছানা ছেড়ে উঠে যে ঘানিগাছে লাগ্‌তে হ'ত—তা থেকে ছুটি পেত একেবারে রাত সাড়ে দশটায়। সকালে সাতটা থেকে ন'টা টিউশনি, তারপর দশটা থেকে পাঁচটা—কোন কোন দিন বা সাড়ে ছ'টা সাতটা পর্যন্ত অফিস (এসব দিনে বাড়ি ফিরে জলখাওয়ারও সময় হ'ত না ওর)। তারপর আবার দুটো টিউশনি, একটা সাতটা থেকে আটটা আর একটা সাড়ে আটটা থেকে দশটা। এরপর এসে কোনমতে মুখে দুটো ভাত গুঁজে যখন বিছানায় এলিয়ে পড়ত অন্নু, তখন কোন রকমের স্বপ্নই ওর জাগ্রত বা আচ্ছন্ন চৈতন্যে দেখা দিত না। থার্ড ক্লাস গাড়ীর ঘোড়ার মতই লাগাম খোলার পর একেবারে অচল অনড় হয়ে পড়ত।

তবু—

তবু স্বপ্ন ও দেখেছে বৈকি ! যা ছিল ওর মজ্জায় মজ্জায় মিশে, যা ছিল ওর ধমনীর প্রতি রক্তকণায়—সে প্রচণ্ড কামনাকে ও মুছে ফেলবে কী ক'রে—কী দিয়ে ? অফিসের অসংখ্য ফাইলের মধ্যেও সে কল্পনা মাঝে মাঝে উন্মনা করেছে অনুকে। একটি ছাত্রের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আর একটি ছাত্রের বাড়ী যেতে যেতে অকস্মাৎ পথের ধারের বকুল কিংবা কারুর টবে-পোঁতা হেনার গন্ধ ওকে ফুলশয্যার প্রণয়-বিহ্বল সুধাগন্ধী রাত্রির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ট্রামে চড়তে বা নামতে ভীড়ের ফাঁকে ফাঁকে চকিতে-দেখা চাঁপাফুল বা হেলিওট্রোপ রঙের সাড়ী ওর বেদনাকে আঘাত করেছে—দ্রুত-চলে-যাওয়া মোটর গাড়ীর মধ্যে চন্দন-চর্চিত নববধূর মুখের একটা অস্পষ্ট ছবি মুহূর্তের জন্য রক্তস্রোতকে ক'রে তুলেছে চঞ্চল !—আর সব চেয়ে, অতিকষ্টে সঞ্চিত টাকাতে কোন মতে যখন একটির পর একটি বোনের বিয়ে দিয়েছে তখন বিবাহের সহস্র অনুষ্ঠান ও আয়োজন কি ওকে পীড়িত করে নি ? ওর সমস্ত অন্তর তীব্র বাসনার বিষে ছট্‌ফট্ করেছে, নিজের পক্ষে যা সুদূর, যা সম্ভবই হয়ত হবে না—তারই ছবি এঁকেছে ও মনে মনে—অসংখ্যের বন্যাস্রোতে গা ভাসিয়েও, নীরন্ধ্র অনবসরের মধ্যেই।

তা ছাড়া, আয়োজন চলেছে এই দীর্ঘকাল ধরেই। নিজের জন্য তক্তপোশ কিনেছে ও সাড়ে তিন হাত চওড়া ; লেপ তৈরি করিয়েছে দুজনের মত। সে লেপ দীর্ঘদিনের ব্যবহারে ছিঁড়ে গেছে, আবার তৈরি করিয়েছে, তাও ডবল। বোনেদের কৈফিয়ৎ দিয়েছে—'কী করব, চওড়া বিছানা না হ'লে শুতে পারি নে, রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেকটা জায়গায় এপাশ-ওপাশ করা আমার স্বভাব। একানে লেপে বড় অসুবিধা, তার চেয়ে বড় ক'রে করাই ভাল। কতই বা বেশী পড়ে !'

আয়না কিনেছে ও বড় দেখে—একদিন একটি সুশ্রী বধূর লাজরক্ত

মুখের ছায়া তাতে প্রতিফলিত হবে বলে। আলমারী কিনেছে, তারই শাড়ী আর পুতুল থাকবে বলে। আরও কত কি খুচরো জিনিস— যা কেনবার কারণ ওর মা বা বোনেরা সন্দেহ পর্যন্ত করেন নি। কী একান্ত আশাতেই না দিন গুণেছে ও মধ্যে মধ্যে—সুদূর ও অনাগত কালের অসংখ্য নাম-না-জানা পদধ্বনির মধ্যে ওর মনের প্রবলতম ইচ্ছা যেন সর্বদা একটি বিশেষ পদশব্দের জন্য কান পেতে থাকত। ওর মনের অর্ধেকটা, একটা চোখ এবং একটা কান যেন ছিল শুধু সেই কল্পলোকবাসিনী নববধূকে ঘিরে ব্যস্ত। জীবনের দৈনন্দিন শুষ্ক কর্তব্য এবং শ্রান্তিজনক কাজগুলো ক'রে যেত একটা ব্যগ্র ব্যাকুলতায়—মনে হ'ত এই সমস্ত দুস্তর বাধা কোনমতে হাত দিয়ে সরিয়ে এই নীরসতার মরুভূমি পেরিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে ও—ওপারে আছে সিদ্ধি, ওপারে আছে অমৃত।

আজ এতদিন পরে ওর সেই প্রতীক্ষার, সেই সুদুশ্চর তপস্যার অবসান হয়েছে, এবারে আর কোন বাধা কোথাও নেই। বোনদের সকলকারই বিয়ে হয়ে গেছে, প্রথমে যে আফিসে ঢুকেছিল তা থেকে এখন ভাল অফিসে চাকরী পেয়েছে, মাইনে ভাল—কাজও পাকা। একটা মোটা রকমের জীবন-বীমা আছে ওর, তাতে প্রায় বছর-আষ্টেক কিস্তি দেওয়া হয়ে গেছে। টিউশনি না করলেও চলে, তবু একটা টিউশনি রেখেছে ও—সেটাতে খাটুনি কম—মাইনে বেশী। মোটামুটি ওর যা আয় তাতে ওদের ছোট সংসার চালিয়ে টাকা জমাতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। কলকাতায় না হোক, শহরতলীতে একটু জমি আর মাথা গোঁজবার মত খান-দুই ঘর অনায়াসেই করতে পারবে। বেশী দিনও অপেক্ষা করতে হবে না, অফিসে যে সামান্য দেনাটা আছে সেটা শোধ হ'লেই ও আবার ধার পাবে—এবার বোধ হয় হাজার-দুই টাকাও নিতে পারবে। জমি কেনার কাজটা যে-কোন সময়েই সারা যেতে পারে। এক কথায় আজকে ওর জীবন-যাত্রা

নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন, ভবিষ্যতের জন্য শুধু যে কোন দায় নেই তা নয়—বিশেষ কোন আশঙ্কাও নেই।

কিন্তু তবু—

পথ চলতে চলতে সেই কথাটাই অনিমেষ বার বার ভাবতে লাগল—তবুও মনে কোন উৎসাহ পাচ্ছে না কেন? যা ও এতদিন ধরে একান্তভাবে চেয়েছে—উদগ্র কামনার সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হাত পেতে নিতে ওর এই শঙ্কা, এ সঙ্কোচ কিসের? আরও কী চায় অনু? মেয়ে মাঝারি—টাকা বেশী পাবে না, তাই কি আপত্তি? তাতে কি ওর পৌরুষের অহঙ্কারে কোন আঘাত লেগেছে? কিন্তু না—ও তো কোন দিনই এ সব কিছু চায় নি। ওর স্ত্রী সুন্দরী হবে—এমন স্বপ্ন একদিনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না। আর টাকা? টাকা তো সে বহু পেতে পারত বিয়ে করে? অনেকেই সে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বোনেদের বিয়ের জন্য ভাবনা কি হে, বড় লোকের মেয়ে বিয়ে কর, যে টাকা পাবে তাতেই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে। সত্যিই—পাঁচ, ছয়, এমন কি দশ হাজার টাকার লোভও তাকে দেখান হয়েছে অনেকবার কিন্তু শ্বশুরের টাকায় নিজের স্বাচ্ছন্দ্য কেনবার মত নীচতা ওর মনে কখনও আসে নি। রূপও চায় নি, রুপোও চায় নি অনু—চেয়েছে ও একটি বধূ—খুব কুৎসিত না হয়, এই পর্যন্ত!

তবে?

এই তবের-ই কোন উত্তর যে মনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। অফিসে পৌঁছতে 'লেট' হয়েছে—এখন দ্রুত কাজ সারা দরকার কিন্তু কোনমতেই আজ সে তার কাগজপত্রে মন দিতে পারলে না। শিকোহাবাদ ডিপোর এই ফাইলটা আজ শেষ করতেই হবে, কাল বড় সাহেব নিজে তাগাদা দিয়েছেন—ওধারে কলম্বোর ডাক যাবে আর ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই, সে কাজগুলোও সেরে ফেলা প্রয়োজন—এই কথাটা মনে মনে জপ করছে ও, কিন্তু কোন চাবুকেই মন যেন সাড়া দিচ্ছে না। ফাইল সামনে খোলাই আছে, কলমের কালিও কলমে

শুকোচ্ছে, [illegible] দৃষ্টি আজ কিছুতেই টেবিলের এই বস্তুগুলিতে যেন আবদ্ধ থাকছে না—অনেক দূরের খোলা জানলা দিয়ে বারবার বেরিয়ে যাচ্ছে, বাইরের ঐ একটুক্‌রো আকাশের দিকে। শূন্য, অর্থহীন আকাশ!

শেষে, বেলা তিনটে নাগাদ ও বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। বড়বাবুর কাছে গিয়ে বললে, 'বড্ড মাথাটা ধরেছে পরেশদা, কিছুতেই বসতে পারছি না—'

যে লোক অফিস কামাই করে কদাচিৎ এবং অফিসে এসে সব চেয়ে কম ফাঁকি দেয়, সে যে বিশেষ কারণ ছাড়া এ অনুরোধ করছে না, পরেশবাবুর তা বুঝতে দেরি হ'ল না। তিনি সস্নেহ-কণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও ভাই, বাড়ী চলে যাও—তোমার ঐ শিকোহাবাদের ফাইলটা তো? ও আমিই সেরে নিচ্ছি!'

কিন্তু অফিস থেকে বেরিয়ে অনিমেষ তখনই বাড়ী গেল না। বাড়ী গেলেই সেই প্রশ্ন উঠবে—মা তাঁর উত্তর চাইবেন তখনই। অথচ কোন উত্তরই তখন পর্যন্ত ওর মনের মধ্যে দানা বাঁধে নি—ওর সমস্ত চিন্তাশক্তি যেন কেমন বিহ্বল, আচ্ছন্ন হয়ে আছে।···

অনিমেষ ঘুরতে ঘুরতে ইডেন-গার্ডেনের একটা গাছতলায় গিয়ে বসে পড়ল। একটা দারুণ সংশয় ওর মনে জেগেছে—এতদিন যে স্বপ্ন ও দেখেছিল তা কি কোন রক্তমাংসে-গড়া তরুণী মেয়ের? যে উগ্র বাসনা ওর দিনরাত্রিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল, সে কি ধীরে ধীরে ওকে বাস্তব থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় নি! ওর এই আটত্রিশ বছর বয়সের সু-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রার অভ্যাসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কি সেই নববধূর স্বপ্ন দেখেছে ও? তার আঠারো-কুড়ি-একুশ বছরের যে মন একটি লাজনম্রা কিশোরী বধূর প্রত্যাশা করত, সে মন কি আজ একেবার মরে যায় নি! গ্যাসের আলোর ম্যাণ্টেল্‌টা নাকি একদা রেশমের জালকে অবলম্বন ক'রেই রচিত হয়, তারপর রেশমটা যায় পুড়ে; মসলাটা কিন্তু তখনও সেই ছাঁচের আকারে শূন্যে

দাঁড়িয়ে থাকে। তা থেকে আলো পাওয়া যায় ঠিকই—আকারও নষ্ট হয় না, কিন্তু হাত দিয়ে তাকে ধরতে গেলেই গুঁড়িয়ে যায়। তার মনেরও কি আজ সেই অবস্থা হয় নি?

এ সব প্রশ্নের কোন স্পষ্ট উত্তর পায় না অনু। কিংবা যে উত্তর পায় তা ওর পছন্দ হয় না, তাই সেটাকেও এড়িয়ে যেতে চায়। সব চেয়ে বড় কথা যে, ও আজকাল এমন কতকগুলো দৈহিক ও মানসিক অভ্যাসের বশীভূত হয়ে পড়েছে, যে সব অভ্যাসের মধ্যে একটি অপরিচিতা মেয়ের খাপ খাওয়ানো কঠিন। যে আসবে সেও আর ঠিক ওর কল্পনামত কিশোরী মেয়ে নয়, এত বয়সের বিয়ে—সেই হিসাব-মত বয়স্কা মেয়েই নিতে হবে তাকে। তারও কি কতকগুলো অভ্যাস বদ্ধমূল হয়ে যায় নি—কতকগুলো ধারণার ছাপ পড়ে নি মনের ওপর স্পষ্ট হয়ে? জীবন-সম্বন্ধে তুজনের দৃষ্টিভঙ্গী যদি তু-রকম হয়—তাহ'লে!

ওর যেসব বন্ধুবান্ধবদের অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছে তাদের কাছে কত গল্পই তো শুনেছে সে! রাতের পর রাত তারা জেগে কাটাত বাজে গল্প ক'রে, ফলে পরের দিন সকালে তারা চোখ চাইতে পারত না, চোখ থাকত লাল হয়ে। দিনের বেলায় যেখানে সেখানে বসে ঘুমিয়ে পড়ত—পড়া, কাজ সব হ'ত পণ্ড। তারপর বয়স যত বাড়ল তার অন্য অবিবাহিত বন্ধুরা বিয়ে করলে, কেউ আটাশ কেউ বা ত্রিশ—তাদেরও ঐ অবস্থা। তাদের রীতিমত কষ্ট হ'ত—পরের দিন আরক্ত, নিদ্রাহীন চক্ষু জ্বালা করত—বেচারাদের তবু রেহাই ছিল না। কারণ যাঁরা এসেছেন তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য ছাড়বেন কেন? তাঁদের তো আর অত বয়স হয় নি! অকারণে রাত জেগে বাজে গল্প করার আনন্দ তাঁদের প্রাণে তখনও আছে, তাঁদের জীবন তো টাকা-আনা-পাই-এর হিসাবে বাঁধা পড়ে নি।

এসব অবশ্য তুচ্ছ কথা। তবু অনিমেষের মনে এই সব সামান্য কথাও আশঙ্কা জাগায় বৈ কি! সাড়ে দশটার পরে অনিমেষ কোনদিন

জেগে থাকতে পারে না ; রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত জেগে কারুর বাপের বাড়ীর বিবরণ শুনছে, এ কথা মনে হ'লেই যেন ওর হাসি পায়। কীই-বা আছে ওদের গল্প করার ? অনেক লেখাপড়া জানা মেয়ের সঙ্গেও অনিমেষ গল্প করেছে কিন্তু সবই সেই এক প্রসঙ্গ। বড় জোর—শাড়ী ব্লাউজের গল্প কিংবা কলেজের কোন বন্ধুর দাম্পত্য-জীবনের কাহিনী। পৃথিবীর বৃহত্তর ঘটনা সম্বন্ধে না আছে ওদের কোন চিন্তা, না আছে কোন ধারণা।

তবু, অনেকক্ষণ ভাববার পর অনিমেষকে এ কথাটা স্বীকার করতেই হ'ল যে, এই সব অতি সাধারণ মেয়েদের নিয়েই সংসারের সাড়ে-নিরানব্বইটি পুরুষ জীবন কাটাচ্ছে—যারা তা পারছে না তাদের জীবন মরুময় মনে করছে তারা। এদেরই কামনা ক'রে আসছে পুরুষ স্মরণাতীত কাল ধরে—পৃথিবীর যা কিছু মারামারি, যুদ্ধ-বিগ্রহ অধিকাংশরই মূলে আছে এই সব বুদ্ধিহীনা সাধারণ নারী। এমন কি এরাই নাকি সমস্ত কবিতা ও সাহিত্যের উৎস। সুতরাং অনিমেষই বা পারবে না কেন ? ইংরাজিতে যাকে বলে 'অবিবাহিত অভ্যাস' তারই কতকগুলো ওর স্বভাবে এসে গিয়েছে, তাই ? অভ্যাস বদলাতে কতক্ষণ ! খানিকটা নির্জনে নিঃসঙ্গ থাকা ওর প্রয়োজন ? বেশ তো—কলকাতার রাস্তা কিংবা পার্ক তো কেউ ঘোচায় নি। মধ্যে মধ্যে তাঁকে বাপের বাড়ীতেও পাঠানো যেতে পারে।

আচ্ছা—বিয়ে না করলে কি হয় ?

কথাটা আস্তে আস্তে ঠিক ধারণায় পৌঁছতে অনিমেষ শিউরে উঠল। চিরকাল এম্‌নি থাকতে হবে ? এম্‌নি নিঃসঙ্গ, এম্‌নি একা ? কবিরা যাকে কাব্য ক'রে বলেন 'আত্মার আত্মীয়'—এমন কেউ এসে দাঁড়াবে না ওর কাছে ? দুঃখে সান্ত্বনা দিতে, রোগে সেবা করতে, আনন্দের অংশ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে—কেউ না ? ওর এতদিনের এই একাগ্র, তীব্র কামনা ব্যর্থ হবে—আর ও নিজেই তা ব্যর্থ ক'রে দেবে স্বেচ্ছায় ?

না, না, না,—তা সম্ভব নয়। সমস্ত অন্তরটা অনিমেষের যেন বেদনায় টন্ টন্ ক'রে উঠল। দায়িত্ব যত বড়ই হোক সে এতটা হারাতে পারবে না। হয়ত ঠিক সে সুরটি বাজবে না, সে স্বপ্ন ঠিক সফল হবে না তবু যা নিতান্তই কল্পনা, সুদূর সম্ভাবনা মাত্র তার জন্য সবটা নষ্ট করতে সে রাজী নয়। জীবনে যেটুকু রস এখনও পাওয়া সম্ভব, যে সুর আজও বাজতে পারে, তাকেই বা ক্ষোয়াবে সে কোন দুঃখে ?

অনিমেষ উঠে পড়ল। ইডেন গার্ডেনে গাছের ছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে : সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। অথচ ঠিক টিউশনি করতে যেতেও ইচ্ছা করছে না ওর। অবশ্য একদিন না গেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না—তবে বাড়ী ফিরতেও যেন ভাল লাগছে না। বিয়ে সে করবে ঠিকই—কিন্তু জবাবটা মাকে এখনই দেওয়া—! কোথায় যেন একটা দ্বিধা এখনও আছে !

সে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পথ চলতে লাগল। মাঠ থেকে চৌরঙ্গীর মোড়, সেখান থেকে জনকোলাহল মুখরিত ধর্মতলা ষ্ট্রীট—লক্ষ্যহীন ভাবে সে হেঁটেই চলেছে। হঠাৎ চমক্ ভাঙল ওর শাঁখারীটোলার মোড়ে এসে। এই গলিতেই ওর বাল্যবন্ধু যোগেশের বাড়ী। বহুকাল তার সঙ্গে দেখাশোনা নেই, খবর নেওয়াও হয়ে ওঠে না। আজ যখন ছেলে-পড়ানো হ'লই না, তখন খবর নিয়ে গেলে কি হয় ?

সে অন্যমনস্ক ভাবেই মোড় ঘুরল। বাড়িটাও বেশী দূরে নয়—এই যে, তেমনি শ্রীহীন, পুরোনো বিবর্ণ বাড়ী। যোগেশ মাঝারি কেরানী, আয় একেবারে কম নয় তবে সংসার বড় ব'লে কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারে না। নিজের সংসার নিয়ে বিব্রত—কোনমতে অফিস সেরেই যে কোটরে এসে ঢোকে, আর বেরোয় না। তাই তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তারই বাড়ীতে আসতে হয়, আর কোন উপায় নেই।

কড়া নাড়তে যোগেশ নিজেই এসে দোর খুলে দিলে। একটা খাটো কাপড় পরা, শতছিন্ন গেঞ্জি গায়ে—কোলে একটি রুগ্ন শিশু! মুহূর্ত-কয়েক যেন অবাক হয়ে অনিমেষের চোখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ খুশী হয়ে উঠ্‌ল, 'কে রে অনু? আয়, আয়—কি ভাগ্যি!'

বাড়ীটা দোতলা, কিন্তু আয় বৃদ্ধির জন্য ওপরটা ভাড়া দিতে হয়েছে। নীচের তলায় দুখানি ঘরে ওরা সপরিবারে থাকে; তারই মধ্যে গিয়ে বসতে হ'ল অনিমেষকে। বুড়ো মা আছেন, তাঁর দু-চোখ অন্ধ—বৌয়ের সেবা ছাড়া একদণ্ড চলে না, অথচ অনবরত বসে বসে তিনি বৌকে গাল পাড়েন। প্রাকৃতিক কর্মগুলো তিনি প্রায়ই ঘরের মধ্যে ক'রে ফেলেন বলে সে ঘরটা তাঁকেই ছেড়ে দিতে হয়েছে, বাকি একখানা ঘরেই যোগেশরা সকলে থাকে। ছ-সাতটি ছেলেমেয়ে, ওর স্ত্রী, যোগেশ নিজে। দুটো ভাঙ্গা চৌকিতে একটা বড় বিছানা হয়, তাতে ওর স্ত্রী ছোটগুলিকে নিয়ে শোয়—বড় দুটিকে নিয়ে যোগেশ শোয় মেঝেতে; নিচে আর একটা বিছানা ঐ সংকীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যেই পড়ে।

এ সবই অনিমেষের জানা আছে, তবু আজ ঘরে ঢুকে যেন হঠাৎ তার দম বন্ধ হয়ে এল। যোগেশের স্ত্রীও রুগ্না—তার ওপর সমস্ত সংসারের কাজ ও শাশুড়ীর সেবা করতে হয়, ফলে অত্যন্ত খিট্‌খিটে মেজাজ তার। এই মাত্র কি কারণে একটি মেয়েকে বোধ হয় খুব ঠেঙ্গিয়েছে—সে মুড়ি খাচ্ছিল, খেতে খেতে সব ছড়িয়ে দিয়ে বিকট চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। আর একটি তারই পাশে অপকর্ম ক'রে ফেলে নির্বিকার চিত্তে মাখছে বসে বসে। ছেঁড়া কাগজ, ভিজে কাঁথা, জল, ময়লা, মেঝেময় থৈ থৈ করছে—দারিদ্র্য ও অব্যবস্থার ছাপ চারিদিকে। ছেলে-মেয়েগুলির কারুর স্বাস্থ্য ভাল নয়—বোধ হয় সেই জন্যই তারা দিনরাত কাঁদে, ঝগড়া করে ও বায়না নেয়। তবু তাদের দিকে চাইলে রাগ হয় না, দুঃখই হয়।

কোনমতে অনিমেষ নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে চৌকীটারই এক কোণে গিয়ে বসল। তখন সব বিছানাটা করা হয় নি, শুধু মাঝখানে একটা ছোট বিছানার ওপর অধিকতর রুগ্ন একটি বছর পাঁচ-ছয়ের ছেলে শুয়ে ছিল। সেদিকে চেয়ে যোগেশের দিকে জিজ্ঞাসু চোখ তুলতেই সে বলে উঠল, 'আর বল কেন ভাই—ছেলেটার আজ বাইশ দিন টাইফয়েড্। এমনি তো এটার আমাশা ওটার জ্বর লেগেই আছে, তার ওপর এই রাজার রোগ। পয়সা-কড়ির আদ্য-শ্রাদ্ধ তো হচ্ছেই—রাত জেগে জেগে শরীর মাটি হ'তে বসেছে! দিনের বেলা অফিস করব, রাত্রিবেলা বাড়ী ফিরে রাত জাগব—কত সুখে আছি!'

মিনিট খানেক চুপ ক'রে থেকে গলাটা একটু নামিয়ে যোগেশ আবার বলল, 'বেশ আছিস তুই মাইরি। ঝাড়া-হাত-পা—নিশ্চিন্তি। কী বলব, বিয়ে ক'রে ইস্তক শান্তি কাকে বলে জানলুম না। ওঁর তো ছেলেবেলা থেকেই অম্বলের ব্যথা, বুকের অসুখ, বাত ছিল—এখন আবার বছর-তিনেক ধরে শুরু হয়েছে রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘুষ-ঘুষে জ্বর। তাই নিয়েই সব হচ্ছে—কে আর করবে বল। ডাক্তার হয়েছে আমার বাস্তু-দেবতা।'

দুটো ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যে মারামারি বাধিয়ে বিরাট হল্লা শুরু করেছিল, তাদের গণ্ডগোল একটু থামতে অনিমেষ প্রশ্ন করলে, 'তোর একটি বোন ছিল না এখানে—কী হ'ল?'

গলা আরও নামিয়ে বললে যোগেশ, 'কিছুতেই ভাই আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার বনে না। বিধবা বোন বাড়ী থাকলে কাজ-কর্মের সুবিধা হয় বটে কিন্তু বড্ড অশান্তি। আমার বৌ বলে যে, ওর চেয়ে খেটে মরে যাই সে-ও ভাল—'

হঠাৎ অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। চারিদিক থেকে কিসে যেন ওর কণ্ঠরোধ ক'রে ধরছে—মনে হচ্ছে বাতাস কোথাও নেই। যোগেশ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কিরে এখনই উঠলি? একটু চা খেয়ে গেলে—'

'না ভাই টিউশনি আছে তো!' অনিমেষ একেবারে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়ল, 'আর একদিন সকাল ক'রে আস্‌ব'খন—আজ তবে আসি!'

স্খলিত, ক্লান্তপদে অনিমেষ গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরল। মা উদ্বিগ্ন হয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কি রে, এত রাত, মুখচোখই বা এমন কেন? শরীর খারাপ করেনি তো?'

'না—এম্‌নি বড় ক্লান্ত।' কথাটা অনিমেষ কোনমতে এড়িয়ে গেল। প্রশ্নটা অবশ্যম্ভাবী, তবু যত দেরিতে আসে ততই ভাল।

আহারাদির পর মা রান্না-ঘরের পাট সেরে ছেলের ঘরে এসে বসলেন। অনিমেষ এসেই শুয়ে পড়েছিল, তার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা বললেন, 'বুড়ো হয়ে পড়েছি রে, আজকাল এই দুটো লোকের কাজ, তাই যেন ভারি লাগে। একটা লোক এনে দে বাপু, আর পারি না। কতকাল করব বল্ তো একলা বুড়ো মানুষ? ঠাকুর পো এবেলাও এসেছিলেন—'

অনিমেষ চম্‌কে উঠ্‌ল। একা, নিঃসঙ্গ থাকার সুখ আজ যেন নতুন ক'রে ওর চোখে ধরা পড়ছে; ভূতের মত খেটেছে এতদিন, সেবা, প্রেম, সাহচর্য কিছু পায় নি, তবু স্বাধীনতা ছিল। মধ্যে মধ্যে নিজেকে নিয়ে যেটুকু থাকতে পারত তাইতেই যেন শান্তি পেত। বিয়ে করলে? হয়ত যোগেশের অবস্থা ঠিক হবে না ওর—তবু সর্বপ্রকার বন্ধন এবং পরাধীনতা। আর একটি অপরিচিতা নারীর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে দেওয়া।

না, না,—সে আর সম্ভব নয়। ওর পক্ষে অন্তত নয়—বিশেষ এই বয়সে!

অনিমেষ প্রায় চেঁচিয়েই বলতে চাইল, না, বিয়ে সে করতে

পারবে না আর—সে বয়স, সে সুযোগ চলে গেছে। ওর জীবনের লগ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে।···কিন্তু কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের অনেকখানি যেন বেদনায় টন্ টন্ ক'রে উঠল। এমন একান্ত ক'রে চাওয়া—দিনরাত্রি-পূর্ণ-ক'রে-রাখা ওর স্বপ্ন—একেবারে মিথ্যা, একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে? এই শেষবারের মত 'না' বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মানব-জীবনের একটা বৃহত্তর পরিণতির পথ চিরদিনের মত রুদ্ধ হয়ে যাবে ওর সামনে? কোথাও কোন সম্ভাবনা থাকবে না?

অকস্মাৎ যেন পাগলের মত আকুলি-বিকুলি ক'রে উঠে বসল ও। বললে, 'মা, একটা কথা বলি নি তোমাকে এতদিন। আমার—আমার একটা ফাঁড়া আছে এই বছরে। একজন বড় জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলেন। এই তো কটা মাস, যাক্ না। এতদিনই যখন গেল—'

যে টাকা করচ ক'রে ওর বাবা এখানে ওর বিয়ে দিলেন, সে টাকায় কি আর শহরে ভাল পাত্র পাওয়া যেত না ? ওর বাবার সব বাড়াবাড়ি—জমি, জমি, জমি ! যারা চাকরি ক'রে খায় শহরে, তারা যেন মানুষ নয়—তিনি নিজে যেন মানুষ নন্—তাই এত টাকা খরচ ক'রে এই জঙ্গলের মধ্যে, এই ঈশ্বরের-ভুলে-যাওয়া জায়গায় বিয়ে দিতে হ'ল মেয়ের ! মনে মনে রাগে গজরায় উৎপলা ; এই জন্যই কি সে লেখা-পড়া শিখেছিল, এই জন্যই কি জন্মাবধি ইলেকট্রিক আলো, কলের জল, ড্রেন-পাইখানা এবং থিয়েটার-সিনেমা-ফ্যান্সী-ফেয়ারের মধ্যে মানুষ হ'ল ?

নিতাই অবশ্য চাকরি করে বটে, রাঁচী না হাজারীবাগ না ঐদিকে কোথায়, তবে উৎপলার বাবা যে সে চাকরি দেখে মেয়েকে ওর হাতে দেন নি, এটা ঠিক। সে সামান্য চাকরি, অস্থায়ী—কবে আছে কবে নেই—সেখানে উৎপলাকে নিয়ে গিয়ে বাসা করতে সে কোনদিনই পারবে না। ঐ অজ পাড়াগাঁয়েই তাকে জীবন কাটাতে হবে চিরকাল। মূর্খ স্বামী, ততোধিক মূর্খ (হয়ত বা নিরক্ষর) তার আত্মীয়-স্বজন, গরু-বাছুর-কিষাণ-রাখাল এবং এক বন্দে সাড়ে তিনশ' বিঘে জমি, এর মধ্যেই জীবন কাটিয়ে একদিন হয়ত সেই জঙ্গলের মধ্যেই ইহলীলা শেষ করে বিদায় নিতে হবে। আশা নেই, আনন্দ নেই, ভবিষ্যৎ নেই—সব অন্ধকার। ভাবলেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে উৎপলার। কেন যে সে বিদ্রোহ করে নি, কেন যে সে আত্মহত্যা করবার ভয় দেখিয়ে এ বিয়েটা বন্ধ করে নি—নিজের সেই নির্বুদ্ধিতার কোন কারণই খুঁজে পায় না।

ওর বাবা অবশ্য তখন সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'এইত ষাট মাইল

রাস্তা, একে কি আর দূর বলে ? আমি চাই কি সপ্তাহে সপ্তাহে গিয়ে তোর খবর নিতে পারব—তুইও মন করলেই আসতে পারবি। তা ছাড়া নিতাইয়ের বাবাকে আমি জানি, লোক ওরা কেউ খারাপ নয়। কলকাতার এক এঁদোপড়া বাড়িতে, না হয় বড়জোর তিনশ' টাকা মাইনের কেরানীর বৌ হতে পারতিস! তাতে কি সুখ পেতিস্ ? চিরজীবন একটা ঘানিকলে ঘুরতে হ'ত, না অন্তরে না বাইরে, মুক্তি কোথাও থাকত না। তার চেয়ে এ ঢের ভাল হ'ল। চাকরি যেমনই করুক, মাইনে যতই পাক্—আজকালকার বাজারে টাকার দাম কি ?'

কিন্তু এসব যে বাজে কথা তা উৎপলা জানে। শুনতেই ষাট মাইল। বাহান্ন মাইল ট্রেনে যেতেই ও লাইনে সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লাগে—তাও ট্রেন দিনরাতে তিনখানি! কে বলবে এটা এ্যাটমের যুগ। আর বাকী সাত আট মাইল গরুর গাড়িতে—সে নাকি আরও সাড়ে চার ঘণ্টা। এত কষ্ট করে যে কেউ তার খবর নিতে যাবে না ফি হপ্তায়, তা সে বোঝে। আর সে-ও ঐ ঘর থেকে মন-করলেই যা আসতে পারবে—তাও জানা আছে।

অভিমানে উৎপলার দুই চোখ জ্বালা ক'রে জল ভরে আসে। সকলকার ওপরই যেন ওর অভিমান—বিশেষ করে বাবার ওপর। তিনি নাকি ওকে খুব ভালবাসেন। ছাই বাসেন—এই যদি ভালবাসার নমুনা হয়ত অমন ভালবাসায় দরকার নেই। এইত বেলা দেড়টায় ট্রেনে চেপেছে এখনও পর্যন্ত পৌঁছল না। অথচ বাহান্ন মাইল মাত্র নাকি পথ! তারপর সেখানে যে কী অদৃষ্টে আছে কে জানে। এরা তো বলাবলি করছিল যে যদি পাল্‌কী পাওয়া যায় তবু অল্পে রেহাই—নইলে গরুর গাড়িতে সাড়ে চার ঘণ্টা পাক্কা! সত্যি-সত্যিই গরুর গাড়ি চড়তে হবে নাকি ? বিয়ের কনে যাবে গরুর গাড়ি চড়ে ? ছি ছি! তার চেয়ে ঘেন্না আর কি আছে!

২

কিন্তু স্টেশনে নামতে দেখা গেল উৎপলার অদৃষ্টদেবতা তার চরম পরীক্ষা নেওয়ার জন্যই তৈরী হয়েছেন। পাল্‌কী এ অঞ্চলে মাত্র দু'খানা, তবু অন্য সময় তা সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু আজই, বোধ হয় উৎপলার অদৃষ্ট-ক্রমেই, কাঁকুড়ে-বেগপুরের বাবুরা বিবাহ উপলক্ষে দু'খানা পাল্‌কীই আটকেছেন, তাঁরা গেছেন প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে, আজ আর সে পাল্‌কী ফেরবার সম্ভাবনা নেই।

সুতরাং—গো-গাড়ি!

ওদেরই বাড়ির গাড়ি নাকি দু'খানা এসেছে, আর বাকি আত্মীয় স্বজনদের গাড়ি। বর-বধূ এবং বরযাত্রীদের নেবার জন্য পাঁচ-ছ'খানা গাড়ি প্রস্তুত। ওরই মধ্যে যেখানা সব চেয়ে বড় এবং নতুন, সেই-খানাতেই পুরু ক'রে খড় বিছিয়ে এবং তার ওপর শতরঞ্জি পেতে বর-কনের জন্য ব্যবস্থা করা হ'ল। একজন বললেন, 'আজ তো কালরাত্রি, যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, বর কনেকে আলাদা বসালে হয় না?' কিন্তু তখনই তার প্রতিবাদ এল, 'কনের সঙ্গে তাহলে যাবে কে? ঝি থাকলেও না হয় হ'ত। তার চেয়ে ওরাই একটু সাবধানে থাকবে'খন। বৌমা, তুমি মুখ-টুখ ঢেকে বসো গো বাছা, নিতাইও খুব সাবধান। আজ কালরাত্রি!'

সত্যি, বাবা একটা ঝি পর্যন্ত সঙ্গে দেন্ নি। কী আশ্চর্য লোক! আজন্ম-পরিচিত ঘর এবং পরিবেশ ছেড়ে সে এই একেবারে-অপরিচিত মানুষের মধ্যে অজানা দেশে আসছে—একা! এমন ভাগ্য কারুর হয়? বাবার যুক্তি হ'ল, 'শহরের ঝি পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কেবল নাক তুলবে। তাতে মেয়েরও মনে প্রথম ইম্‌প্রেশেন্‌টা খারাপ হয়ে যাবে—আর তারাও অপমানিত বোধ করবে। এ নিয়ে বহু অশান্তি আমি হ'তে দেখেছি।'

তা বেশ করেছেন, কিন্তু কোলের ভাইটাকে তো সঙ্গে দিতে পারতেন! তার বেলা পরীক্ষার ছুতো ক'রে তাকে আটকে রাখলেন। বন-দেশে গিয়ে যদি তার অসুখ করে? সে যে বেটাছেলে, তার

ওপর মমতা যে বেশী। উৎপলা নাকি চার ভায়ের একমাত্র বোন, সেজন্য তার খুব আদর—এই কথাই চিরকাল শুনে আসছে সে। আদরের যা নমুনা, আহা!…

গরুর গাড়ির কাছে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল উৎপলা। এর মধ্যে ঢুকবে কি ক'রে? বসবে কোথায়? গাড়ির জানলা-দরজা নেই, তিনদিক ঢাকা উপুড়-করা কী একটা ব্যাপার—এর নাম নাকি ছৈ! পা থাকে কোথায়? আর ঐ যমদূতের মত দুটো মোষ এই গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে? ভাবলেই যে বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

একজন কে সস্নেহে ডাকলেন, 'এসো না বৌমা—এসো, এসো। ও, মোষ দেখে ভয় করছে বুঝি? কিচ্ছু ভয় নেই। ও মোষ খুব শান্ত। তা ছাড়া আমরা তো আছি।'

তা তো আছেন, কিন্তু এই হেলে-পড়া গাড়িতে উঠবে কি ক'রে? পা দিতে গিয়ে পা পিছলে এল জুতো-সুদ্ধ, মাথাটা ঠুকল ঠকাস্ ক'রে। কে একটি ছেলে পেছনে কোথায় হেসে উঠল হি-হি ক'রে, একজন তাকে ধমক দিলেন। আবারও পড়ে যাচ্ছিল, একটি ছেলে হাতটা ধরে ফেলে সামলে নিলে। রাখাল, যে গাড়ি এনেছিল সে বললে 'মাথাটা হেঁট ক'রে গুড়ি মেরে ঢুকে বসো বৌমা, এ তো তোমাদের মটর গাড়ি নয়—এর-চাল-চলন আলাদা!'

কোন মতে জবু-থবু হয়ে জন্তুর মত উঠে বসে উৎপলা, পিছু পিছু স্বামী এসে ঢোকেন। তারপর হঠাৎ গাড়ি তুলে মোষ জোতবার সময় সে আবার এক কাণ্ড। এর জন্য উৎপলা প্রস্তুত ছিল না, হুমড়ি খেয়ে একেবারে নিতাইয়ের ঘাড়ে এসে পড়ল। ছি ছি! কী লজ্জা!…তৃষ্ণায় ওর বুক পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু কাকে বলবে সে কথা, কেউ প্রশ্নও তো করল না। ট্রেনে আসতে আসতে তবু ওর বরের এক বন্ধু একটা লেমোনেড খাইয়েছিল, কিন্তু সে বরফ দেওয়া নয় বলে সবটা খেতে পারে নি। এখন তো বোধ হয় স্টেশন-

সুদ্ধ লোক ঝুঁকে পড়ে মজা দেখতে এসেছে, কিন্তু কারুর কি কথাটা মনে পড়ল না। শহরের লোককে ওরা গালাগাল দেয় বিবেচনাহীন বলে—ওদের খুব বিবেচনা!

গাড়ি চলল মন্থর গতিতে। এত মন্থর যে কোন গাড়ির গতি হ'তে পারে তা উৎপলা কখন কল্পনাও করতে পারে নি। এর চেয়ে মানুষ তো ঢের জোরে চলেই—ভেড়া ছাগলও বোধ হয় চলে। আর তার ওপর কি ঝাঁকানি—মনে হয় যেন হাড়-গোড় সব চূর্ণ হয়ে যাবে এখনই। সঙ্গে যে মানুষটা আছে, সে যে কেমন তাও বোঝে না উৎপলা। কোন সাহায্য করা কি দু'টো সান্ত্বনার কথা বলা তো দূরে থাক—কাঠের মত আড়ষ্ট হয়ে একেবারে পেছন ফিরে বসে আছে সে। ও নাকি দু'টো পাশ করেছে, শহরে চাকরি করে, কলকাতা শহরেও ছিল বছর-দুই; তবু মানুষ হ'তে পারে নি? সেকালে নব-বধূদের লজ্জার সে সব কাহিনী শোনা যেত, তার চেয়েও বেশী লজ্জা যেন ওর। সব স্বামীরই স্ত্রী সম্বন্ধে কৌতূহল থাকে, নানা রকমে সে কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করে, সুযোগ সুবিধা পেলেই আড়ে চায়—নিজের বিয়ে না হ'লেও এমনটা বিস্তর দেখেছে উৎপলা। কিন্তু এ কী, কাল থেকে লজ্জায় মাথাই তুললে না একবারও। এর চেয়ে একা যাওয়াও তার ভাল ছিল একখানা গাড়িতে। আর সারা জীবনই তো তাকে একা কাটাতে হবে এর পর থেকে। ও-স্বামী আর যাই হোক—জীবনের সঙ্গী নয়। এই বন-দেশে তার বাবা তাকে যখন নিঃসঙ্গ নির্বাসনই দিয়েছেন তখন সে একাই এখানে সারা জীবন কাটাবে। বাপের বাড়িতে তো যাবেই না, তাদের চিঠিও দেবে না।

দুঃখে ক্ষোভে, অভিমানে আবারও দুই চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ে উৎপলার।

খানিক পরেই চারিদিক আঁধার ক'রে সন্ধ্যা নেমে আসে। প্রথমে আকাশ লাল হয়—তারপর একসময় ঝুপ্ ক'রে অন্ধকার। এমন ভয়াবহ নিঃসীম নীরন্ধ্র অন্ধকার জীবনে দেখে নি উৎপলা, ভয়ে বুকের মধ্যে হিম হয়ে আসে। কোন্‌টা শূন্য মাঠ, কোন্‌টা গ্রাম আর কোন্‌টা জঙ্গল কিছুই বোঝবার উপায় নেই। শুধু কতকগুলো জোনাকি জ্বলছে, যেন অসংখ্য আগুনের ফুল্‌কি উড়ে বেড়াচ্ছে চারিদিকে—সে আরও ভয়াবহ। সেদিকে চাইলে কোন সান্ত্বনা তো মেলেই না, বুক দুর দুর করে।

বর্ধমান জেলার গ্রাম, রাঢ়ের দিগন্তজোড়া মাঠ চারিদিকে। জঙ্গল বিশেষ নেই বটে—ধূ-ধূ-মাঠ, অবারিত, অনন্ত—কোথাও ডাঙ্গা, কোথাও বা চষা জমি, মধ্যে মধ্যে দু-একটা তাল কিংবা খেজুরের কুঞ্জ—তবু এ যেন আর এক রকমের ভয়াবহতা। হু-হু-হু একটানা একটা ঝোড়ো হাওয়ার মত বাতাস বইছে সর্বদা, সেই বাতাস গাড়ির ছইতে লেগে এবং কানের পর্দায় একটা বিশেষভাবে আঘাত ক'রে সম্পূর্ণ পরিচিত কী একটা শব্দের সৃষ্টি করছে। কেমন একটা অপার্থিব মনে হয় সমস্তটা—গা ছম ছম করে।...

এ যাত্রার কি শেষ হবে না? মনে মনে প্রশ্ন করে উৎপলা। পিঠটা চড় চড় করছে, ঠোকা খেয়ে খেয়ে মাথা টাটিয়ে উঠল—তবু গন্তব্যস্থলের কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে না। সময়ের হিসাব নিশ্চিহ্ন হয়ে একাকার হয়ে গেছে। কখন চেপেছে, ক-ঘণ্টা কাটল এ গাড়িতে—তার কোন হিসেব নেই, ধারণাও নেই। গাড়োয়ান মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করছে মধ্যে মধ্যে, আগে এবং পিছে যে গাড়ি আসছে তা থেকে অস্পষ্ট একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে মাত্র—মানুষের উপস্থিতির এইটুকু শুধু প্রমাণ ওর চার পাশে! স্বামী তো বোধ হয় বোবা; একটা সাড়া পর্যন্ত দেয় নি এখনও।...

হঠাৎ নিতাই-ই একবার কথা কইলে, অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে,

আড়ষ্ট ও অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, 'ওধারে একটা বালিশ দেওয়া আছে বোধহয়, তুমি শুয়ে পড়তে পারো এদিকে পা ছড়িয়ে। তাতে ঝাঁকুনি কিছু কম লাগবে।'

তবু ভাল! বোবা নয় তাহ'লে একেবারে! কথা বলবার সময়ও কিন্তু সে উৎপলার দিকে মুখ ফেরাল না। কালরাত্রির ভয় বোধহয়? এত কু-সংস্কারও এদের আছে!…একেবারে জন্তু আর কি! স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণায় ওর মন ভরে ওঠে।

তবে সে নিতাইয়ের প্রস্তাবটা গ্রহণ করে সঙ্গে সঙ্গেই, মনে হয় যেন এইটের জন্মই অপেক্ষা করছিল। স্বামীর পাশ দিয়ে নতুন জুতো-সুদ্ধ পা-দুটো টান ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। আঃ—এতে ঝাঁকানি লাগলেও অত কষ্ট হয় না। এটা তো মন্দ নয়—মনে মনে বলে উৎপলা। হাওয়াতে গরমও তত লাগে না, আরামে ওর চোখ দুটো বুজে আসে। কাল ওদের কলকাতার বাড়িতে কী গরমই গেছে। আজ বেশ ঠাণ্ডা কিন্তু। বোধ হয় পাড়াগাঁয়ের দিকে একটু ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডাই থাকে। কে জানে।…

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা উৎপলা কিছুই জানে না, হঠাৎ একসময় কার হাতের মৃদু ঠেলাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ও! নিতাই ডাক্‌ছে। ওর গায়ে হাত দিয়ে নিঃশব্দে ঠেলছে।

উৎপলা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। নিতাই খুব মৃদু কণ্ঠে, ওর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'একটু সামলে বসো, বাড়ি এসে গেছে!'

তারপরই একটা প্রচণ্ড হৈ-চৈ, শাঁকের আওয়াজ, দেশী সানাই এবং য়্যাসিটিলিন গ্যাসের জোর আলো। তার ওপর সেই ক্লান্তিকর পুরোনো কতকগুলো আচার-অনুষ্ঠান। এগুলো ছেলেবেলা থেকে অনেক দেখেছে উৎপলা—প্রায় সবই একরকম পরিচিত। দু-একটা

আচার সামান্য একটু অন্য রকম। সেটা বোধহয় এঁদের নিজেদের বাড়ির নিয়ম-অনুযায়ী।

কিন্তু এই কি ওর শ্বশুর-বাড়ির লোক? এইখানে সারা জীবন কাটাতে হবে ওকে?

কালো কালো রোগা রোগা কতকগুলো পুরুষ, তাদের সকলকারই গায়ে জামা আছে বটে, হয়ত বা সিল্কের জামাও আছে কারুর কারুর, কিন্তু তবু সবটা মিলিয়ে তারা আকৃতি-প্রকৃতিতে একেবারে মাঠের চাষী, এদের নিজেদেরই কিষাণ কি রাখাল থেকে পৃথক ক'রে বোঝা যায় না। আর মেয়েরা! এক গা ক'রে গয়না আছে প্রায় সকলের গায়ে, অত না থাকলেই ভাল হ'ত বরং—কিন্তু যেমন সব কাপড়-জামা, আর তেমনি তা পরবার ছিরি! বরণের সময় ওর শাশুড়ী একখানা সাবেক কালের (বোধ হয় তাঁরও দিদি-শাশুড়ীর আমলের) বেনারসী জড়িয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু প্রাথমিক কাজগুলো সারা হয়ে যাওয়া মাত্র তিনি সেটা ছেড়ে একখানা হলুদ-মাখা আধ-ময়লা মিলের শাড়ি পরে সুস্থ হলেন। ছেলেগুলো সব দিগম্বর—এবং ধূলো-কাদা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার। এরাই নাকি অতঃপর তার আত্মীয় ও আত্মীয়া!

বাড়িটা অবশ্য মন্দ নয়। গ্রামে সব বাড়িই মাটির, শুধু এঁরা সম্প্রতি পাকা দোতালা বাড়ি করেছেন। বড় বড় খান-ছয়েক ঘর, বিরাট দালান ওপর নিচে—সেদিক দিয়ে মন্দ নয়। ওঁদের সাবেক বাড়িতেও নিয়ে যাওয়া হ'ল ওকে—মাটির ঘর বটে সব কিন্তু বেশ উঁচু উঁচু জানলা বসানো—শুকনো খটখটে পরিষ্কার। ওর দিদি-শাশুড়ী পাকা বাড়িতে আসেন নি, লক্ষ্মীকে নিয়ে পুরোনো ভাঁড়ার ঘরেই রয়ে গেছেন। নাত-বৌকে কোলে বসিয়ে আদর করলেন, তারপর সঙ্গে করে ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীর সামনে প্রণাম করালেন। সব শেষে একটি সিঁদুরমাখা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'এইটে মাথায় ঠেকিয়ে

নিজের ক্যাশ-ব্যাক্সয় রেখে দিগে যা, কখনও খরচ করবি না! যদি কখনও আবার নতুন ক'রে লক্ষ্মী পাততে হয় তো এই টাকা দিয়ে লক্ষ্মী পাতবি—নইলে তুই আবার তোর বৌকে এই টাকা দিয়ে যাবি। খবরদার মেয়েকে যেন কখনও দিস্ নি—লক্ষ্মী পরের বাড়ি চলে যাবেন। মেয়েরা সব পরঘরি পান্তামারি, খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করো, এতগুলি টাকা দিয়ে শুধু পরের বাড়ি পাঠাবার জন্যে!'

ঘর-বাড়ি যেমনই হোক—আসবাব-পত্রও খুব খারাপ নয়, আলমারি দেরাজ, এমন কি দু-একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারেরও মুখ দেখা গেল, কিন্তু বিছানার কি কোন বালাই নেই? যেমন সামান্য, তেমনি ময়লা চিট্‌চিটে—এ-সম্বন্ধে এরা একেবারেই উদাসীন। এটা যে বিয়ে-বাড়ি, এখন অন্তত একটু পরিষ্কার রাখা দরকার, এ-কথাটা একবারও মনে হয় নি ওদের। আশ্চর্য! এমন বিছানায় ওদের বাড়ির চাকরও শোয় না। এই রকমই একটা শয্যায় ওকে শুতে হবে নাকি? ভাবতেও যেন আতঙ্ক বোধ হয়।

আর আছেই বা কি, কোথাও তো জড়ো-করা কোন বিছানাও দেখা যায় না। খাট-বিছানা এরা চায় নি বলেই ওর বাবা দেন নি—কিন্তু এর চাইতে চেয়ে নিলেই হ'ত। তবু উৎপলার মনে তখনও আশা ছিল যে ওর শোবার সময় হয়ত একটা ফরসা চাদর পেতে দেবে। কিন্তু রাত যখন গভীর হ'ল তখন ওকে নিজের হাতে খাইয়ে ওর শাশুড়ী ওকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে—আজ নাকি শাশুড়ীর সঙ্গেই শুতে হয়—এবং যে বিছানাটা ও আসা পর্যন্ত পাতাই আছে দেখছে—ছত্রিশটা দিগম্বর শিশু যার ওপর কাদা-মাখা গা ও পা নিয়ে নৃত্য করেছে সারাদিন (হয়ত বা ক-দিনই), মুড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে ছড়ায় নি এমন জিনিসই নেই, একাধিক শিশু যার ওপর কু-কর্ম করার ফলে এখনও তার কোন কোন স্থান ভিজে, অম্লান-বদনে সেই বিছানার ওপরই ওকে বসিয়ে সস্নেহে বললেন, 'তুমি শুয়ে পড়ো বৌমা, আমার সব কাজ চুকিয়ে শুতে আসা তো, সময় হলে হয়। হয়ত

সেই ভোরবেলা এসে একবার নিয়ম সেরে যাব। আমার যে আজ ঘুমোবার সময় মিলবে তা তো মনে হয় না।'

সে সময় উৎপলা একবার মরীয়া হয়ে উঠেছিল বৈকি।

সে কি চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে যাবে এ বাড়ি থেকে? ঐ মাঠ ধরে? কিন্তু পথ যে জানে না? তা ছাড়া এরা সংখ্যাতেও ঢের—ধরে ফেলবে, পাগল বলবে, মিছিমিছি সে এক কেলেঙ্কারি। তবে কি শাশুড়ীর সামনেই তক্তপোশের নিচে থেকে বঁটিটা বার ক'রে নিয়ে গলায় বসিয়ে দেবে? কিংবা শাশুড়ী চলে গেলে এই নতুন শাড়িটা গলায় বেঁধে ঝুলবে কড়িকাঠ থেকে?

কিন্তু কিছুই করা হয় না। সাহসে কুলোয় না শেষ পর্যন্ত। জীবনের মায়া, সম্ভোগের মায়া বড় বেশী। তাছাড়া অল্প বয়স ওর, কৈশোর এবং যৌবন অনবরতই আশা ও আশ্বাস জোগায় মানুষের মনে। সত্যি সত্যি সাময়িকভাবে পাগল না হ'লে কেউ এ-বয়সে আত্মহত্যা করতে পারে না। উৎপলাও পারলে না। বরং দু'দিনের উত্তেজনা, উপবাস, রাত্রি-জাগরণ, দৈহিক শ্রান্তি এক সময় ওর সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন, অবসন্ন ক'রে ফেলে, ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসে। সেই অতিশয় মলিন এবং দীন বিছানাতেই ঘুমোয় ও—অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে।

একেবারে জ্ঞান হয় ওর ভোরবেলা, ননদের ডাকে। কখন যে শেষ রাত্রে শাশুড়ী এসে পাশে শুয়েছেন এবং মিনিট কতক বাদেই আবার উঠে গেছেন, কখন যে আরও দশ-বারোটা ছেলেমেয়ে আর মেয়েছেলে সেই সংকীর্ণ বিছানাতেই অবিশ্বাস্যভাবে স্থান সঙ্কুলান ক'রে নিয়েছে, এমন কি ওর ননদের মেয়েটি ওর শাড়ির ওপরে কু-কর্ম ক'রে আঁচলের অনেকখানিই ভিজিয়ে দিয়েছে—তা ও কিছুই জানে না, ননদের মুখে সকালে শুনলে মাত্র।

ওর এই ননদ রমাটিকেই এ সংসারে একমাত্র 'ওয়েশিস্' বলা যেতে পারে। অন্ততঃ উৎপলার তাই মনে হ'ল। রমা ওরই একবয়সী হবে, যদিও ইতিমধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে হ'য়ে গেছে। ওর স্বামী শহরে চাকরি করে, তার ফলে ওর চাল-চলন, কথাবার্তা অনেকটা শহর-ঘেঁষা। আর কিছু না হোক, সে পরিষ্কার কাপড় পরে এবং এই গ্রাম ও জেলার বাইরের জগতের খবর কিছু রাখে, এই জন্যই উৎপলা কৃতজ্ঞ।

রমা ওকে ডেকে বললে, 'চল বৌদি, আমরা ওধারের ঘাট থেকে কাপড়-চোপড় কেচে আসি। এখানে তো বাথরুম নেই, কুয়াতলায় চল্লিশটা বেটাছেলে জটলা করছে। আমাদের খিড়কীর পুকুরেও ভিড়, সেখানে কাপড় কাচতে তুমি পারবে না। তার চেয়ে এই বেলা চৌধুরীদের পুকুর থেকে কাজ সেরে আসি চল।'

উৎপলা ঈষৎ ভীত কণ্ঠে বললে, 'সেখান থেকে ভিজে কাপড়ে আসতে হবে নাকি?'

'না না—কাপড় জামা আমি নিয়ে যাচ্ছি চল না—'

'কিন্তু সেখানে কাপড় ছাড়ব কোথায়?' অসহায় ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে উৎপলা।

'ওরে পাগল, সেখানে ঢের জায়গা আছে। সে ঘাট খুব নির্জন আর তার পাড় এত উঁচু যে কোথাও থেকে কিছু দেখা যায় না।'

ওরা দু'জন খিড়কীর পথ দিয়ে বেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে খানিকটা চলে একেবারে হঠাৎ যেন মাঠে পড়ল। আসলে ওদের বাড়িটা গ্রামের এক প্রান্তে। ওদের সীমানার পর থেকেই শুরু হয়েছে চাষের জমি—দিগন্ত-জোড়া সে মাঠ। মধ্যে মধ্যে সামান্য কিছু পতিত অনাবাদী জমি হয়ত আছে—সেখানে দু' একটা খেজুর কিংবা ছোট ছোট বনগাছের ঝোপ। আর আছে দু'টো একটা তালের কুঞ্জ—এ-ছাড়া আল দিয়ে ভাগ করা করা জমি। এটা শস্যের সময় নয়, সবে প্রথম লাঙল পড়েছে জমিতে কিন্তু সেই সীমাহীন

বিস্তৃতিরও একটা শোভা আছে, সেদিকে চেয়ে উৎপলা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ওদের বাগানের যেখানটা দিয়ে ওরা বেরোল সেখানটা পাহাড়ের মত, জমিটা উঠে গিয়েছে উঁচুর দিকে। ওদেশে এমনি উঁচু-নিচু জমির অভাব নেই। শক্ত কাঁকুরে মাটি, উঁচু ঢিপিগুলোয় গাছ পালা কম। এমনি একটা টিলায় উঠে আবার নেমে ওধারে যাবার কথা ওদের, কিন্তু একবার ওপরে উঠে উৎপলার পা আর চলল না, সে অবাক হয়ে মাঠের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'কী হ'ল গো বৌদি?' রমা প্রশ্ন করে।

'দেখছি ভাই। এত জমি তো কখনও দেখি নি। এত জমি খালি পড়ে থাকে তা ভাবতেও পারি না।'

'এ সবই তোমাদের জমি—এই এদিকে সোজা চলে গিয়েছে তিনশ বিঘে জমি একবন্দে—সব তোমাদের! এ ছাড়া কালনার দিকে আরও ষাট বিঘে জমি আছে; আবার বাবা তাঁর মামার সম্পত্তি পেয়েছেন—সেই ওকড়শার দিকে—তাও চল্লিশ-পঞ্চাশ বিঘের কম নয়।'

বিঘে ঠিক কতটা তা উৎপলা জানত না। সে প্রশ্ন করলে 'খুব ধান হয়।'

'ধান?' রমা একটু হাসল, বললে, 'খুব কম হলেও বিঘে পিছু আট মণ বাঁধা। এখন আট টাকা ক'রে ধানের দর—মানে মন-পিছু।'

মনে মনে অঙ্কটা কষতে কষতে উৎপলা নেমে চলল। আগের দিন শেষ রাত্রে সামান্য ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও বাতাসে তার আর্দ্রতা। ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। চারিদিকে হু হু ক'রে বাতাস বইছে, তাতে যেন একটা স্বপ্নের আবেশ মাখানো। তখনও সূর্য ওঠেন নি, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে মাত্র। দূর চক্রবালের সে লালিমা এধারের নীলাভ অন্ধকারকে সম্পূর্ণ দূর করতে

পারে নি, শুধু উঁচু তাল গাছের মাথাগুলোয় তার একটু ছোঁয়াচ লেগেছে! তারই মধ্য দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ উৎপলার মনটা একটা অজানা খুশিতে ভরে উঠল—কিসের এ আনন্দ বোঝানো কঠিন। জন্মাবধি ওদের কেরানীবাগানের সেই সংকীর্ণ গলির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা অভ্যাস, বাতাসে চিরকাল ডাস্টবিনের পচা গন্ধই পেয়ে এসেছে—এ যেন একেবারে নতুন, বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা! চারিদিকের কল্কে গাছগুলো হলুদ রঙের ফুলে ভরা—তার সঙ্গে আরও কত অজানা ফুলের গন্ধ মিশে উন্মনা ক'রে তুলছে। সত্যি সত্যিই একদিন এদেশ ওর ভাল লাগবে নাকি! শেষ অবধি বাবার কথাই ঠিক হবে?

রমা পাশ থেকে কুট্ ক'রে প্রশ্ন করল, 'কাল তো সমস্ত ক্ষণই নাক তুলছিলে, আজ কেমন লাগছে এখন?'

উৎপলা যেন চম্‌কে উঠল, 'কে বললে আমি কাল নাক তুলেছিলুম?'

'আমাদের চোখ আছে গো ঠাকরুন! তোমার মনের ভাব কাল ছিল যেন তোমাকে এই জঙ্গলের মধ্যে খুন ক'রে ফেলবার জন্যেই আনা হয়েছে।'

মনে মনে লজ্জিত হ'লেও উৎপলা মুখে জোর দিয়ে বলে, 'তা তো সত্যি কথাই, চিরদিন শহরে মানুষ হলুম, আজ হঠাৎ এই জঙ্গলে এলে ভয় করে না?'

'জঙ্গলটা কোথায় দেখছ? এসব মাঠ না থাকলে শহরে বসে খেতে কি? তোমাদের মত ছ্যাল টিপলে আলো আর কল টিপলে জল—এসব নেই বটে, কিন্তু তেমনি শহরে যে-আর কিছুই নেই! কী সুখে শহরে থাকে লোক তা বুঝি না!'

কাল গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে ওদের রাখালও এই কথাই বলেছিল। অবশ্য তখন তার কথায় কান দেয় নি উৎপলা, কিন্তু এখন মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল, 'বৌদি তোমাদের কলকাতার পায়ে

নমস্কার। একবার গিয়েছিলুম চাকরি করতে, একটা ওষুধের কারখানাতে কাজও পেয়েছিলুম, কিন্তু দেড় মাস না যেতে যেতে পালিয়ে আসতে পথ পাই না। বলি, রক্ষে করো বাবা, রইল তোমার চাকরি। বললে বিশ্বাস যাবেন না বৌদি, দেড় মাসেই শরীর কালি, শুকিয়ে আধখানা হয়ে গিয়েছিল (শরীর তার আরও কালি হওয়া কী ক'রে সম্ভব তা বোঝা গেল না—এম্‌নিতেই যথেষ্ট কালো)। না পাওয়া যায় খেতে কোন জিনিস—আর না পাওয়া যায় একটু বাতাস। আমাদের এখানে যে-সব ফল গাছের তলায় পড়ে থাকলে কেউ ছোঁয় না—তাই কলকাতার লোক গাদা গাদা পয়সা দিয়ে কেনে। খাবার মধ্যে আপনারা জানো শুধু নেয়তক চা খেতে! আর কিছু জোটে!'

উৎপলার ধারণা ছিল ওরা শহরের লোক, যারা শহরের লোক নয় তাদের তাচ্ছিল্য করার জন্মগত অধিকার ওদের আছে। কিন্তু এখন এই সব উল্‌টো কথা শুনে চম্‌কে ওঠে সে। এদের স্পর্ধা তো কম নয়। এদের এমন কী আছে যে শহরকে এত অবহেলা করতে সাহস করে।

বেলে পুকুরের ঠাণ্ডা জলে গলা অবধি ডুবিয়ে বসে থাকতে মন্দ লাগল না উৎপলার—যদিও সাঁতার না জানার জন্য একটু ভয়-ভয়ই করছিল।

'এ কাদের ঘাট ভাই ঠাকুরঝি, লোকজন তো নেই?'

ঠাকুরঝি শব্দটা মুখে আটকায় তবু জোর ক'রে বলে। অভ্যাস তো করতেই হবে, লজ্জা ক'রে লাভ কি?

রমা উত্তর দেয়, 'এটা চৌধুরীদের পুকুর। ওদের আরও দু' তিনটে পুকুর আছে। তাছাড়া এখানে তো পুকুরের অভাব নেই—কত লোক আর একটা পুকুরে আসবে?'

স্নান সেরে ঘোমটা দিয়ে রমার পিছু পিছু বাড়ি ফিরে আসবার সময় উৎপলা ভাল ক'রে বাড়িটা তাকিয়ে দেখল।

ভেতর-বাড়ি আর বার-বাড়ি মিলিয়ে দশটা মরাই—বিরাট বিরাট মরাই।

'এগুলো কি ভাই? খড় দিয়ে জড়ানো ঘরের মত?'

'ধানের মরাই রে—তাও জানো না? এতে ধান থাকে। এক একটাতে প্রায় সওয়া শ' মণ দেড়শ' মণ ক'রে ধান আছে। এ-সব সরু ধান ঘরে খাবার জন্য রাখা হয়। দু-তিন বছরের পুরোনো ধান আছে—এখন যা খাচ্ছি সব পুরোনো ধানের চাল।'

'এত চাল খেতে লাগে?' চমকে না উঠে পারে না সে।

'তা লাগে বৈ কি। লোকজন চাকর-কিষেণ তো কম নেয়। তা ছাড়া এদেশের লোক খায় বেশী। আর ক্রিয়া-কর্ম তো লেগেই আছে। তোমার বিয়েতেই ভাই এক এক বেলায় পঁয়ত্রিশ সের চাল লাগছে, শুধু বাড়ির লোকের জন্যেই।'

আর তা চোখেও দেখে উৎপলা। ভাতের কোন মূল্যই নেই যেন। ওদের সেই র‍্যাশানে সপ্তাহে মাথা পিছু এক সের পাঁচ ছটাক চাল বরাদ্দ, বলতে গেলে ভাত গুণে গুণে খেতে হয়। এ অপব্যয় দেখে উৎপলা শিউরে ওঠে। এত ভাত মানুষ নষ্ট করে কি ক'রে?

একবার রমা উল্কার মত কোন্ কাজের ফাঁকে এসে দাঁড়াতেই উৎপলা কথাটা বলে ফেলে। রমা হেসে উত্তর দেয়, 'ওটাকে আমরা নষ্ট বলে ধরি না ভাই। অত হিসেব ক'রে চাল খরচ করার দরকারও হয় না। এ তো তোমাদের র‍্যাশানের চাল নয়।...আমরা চাষী গেরস্ত—জমি সব খাসে চাষ করানো হয়—চালের অভাব আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। তা ছাড়া গরুরও অভাব নেই, ভাত ঠিক নষ্টও হয় না, গরুতেই খেয়ে নেয়।'

'ক-টা গরু ভাই তোমাদের?'

'আমাদের নয়—তোমাদের। ছ-টা হেলে গরু, যারা হাল বয়—দুটো হেলে মোষ। আর দুধ দেবার গরুও ছ-সাতটা হবে।'

'দুধ কত হয় ?'

'দুধ এখন কমে গেছে—চব্বিশ পঁচিশ সেরের বেশি হয় না—নইলে এক সময় এক মণ অবধি দুধ হ'ত। আগে মোষ ছিল একটা—তার দুধ থেকে শুধু ঘি হ'ত—সে দুধ কেউ খেত না।'

চারিদিকের প্রাচুর্যে যেন হাঁফ ধরে উৎপলার। ওর বৌভাত, দুপুর থেকেই খাওয়ানো শুরু হ'ল। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, শুক্তো, মাছ আর দু'রকমের মিষ্টি—উপকরণের বাহুল্য নেই, লুচি খাওয়ানোর কথা কেউ কল্পনাও করে না, কিন্তু পরিমাণ দেখে চমকে উঠতে হয় বৈকি। লোক যে কত খেলে তার ইয়ত্তা নেই—গ্রামের মেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই ছাঁদা বেঁধে নিয়ে গেল দু-তিন জনের মত—মাছ এক একটা লোক কম ক'রেও খেলে আধ সের, আগের দিনের তৈরী চার মণ বোঁদে এবং সমপরিমাণ পান্তুয়া, নিঃশেষে উড়ে গেল। চারটে নাগাদ রমা ওকে খবর দিয়ে গেল যে সাত মণ চাল তখনই রান্না হয়ে গিয়েছে—হয়ত আরও রাঁধতে হবে।

জীবনযাত্রার বহিরঙ্গে উপকরণের যে অভাব কাল এসে পর্যন্ত ওকে পীড়া দিচ্ছিল, আজ সত্যকার উপাদানের প্রাচুর্য দেখে সে অভাব-বোধের জন্যই ওর লজ্জা হ'তে লাগল—এত রান্না এবং পরিবেশনের জন্য হালুইকর আসে নি—আত্মীয় ও আত্মীয়ারাই কেউ কেউ লেগে গেছেন। ওর শাশুড়ীর কোলে তখনও কচি ছেলে কিন্তু তবু তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম করছেন তা দেখলে বিস্ময় লাগে। দিদিশাশুড়ী, পিস্‌শাশুড়ী—কারুরই নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই।

'এত কী ক'রে খাটেন ভাই ওঁরা ?' বিস্মিত উৎপলা প্রশ্ন করে রমাকে।

রমা হেসে জবাব দেয় 'ওরা তো আর পরের সংসারে খাটছে

না—নিজের সংসারে খাটবে এ আর আশ্চর্য কি? কাজটা যখন নিজের কাজ বলে ঠিক ধারণা হয় তখন আর খাটুনীটা লাগে না। ভয় কি, তুমিও একদিন ঐ রকমই খাটবে।'

কথাটা উৎপলার বিশ্বাস হয় না। ওদের শহরের জীবনে দাসী-চাকর-রাঁধুনী-গাড়ি-ট্রাম-বাসের ঠাস্-বুনোন—যেখানে হাত-পা কোন কাজেই লাগে না। কাজের কথায় ওদের ভয় করে!

কিন্তু মনটা ওর আবার বিষাক্ত হয়ে ওঠে ফুল-শয্যার সময়ে।

স্বামী কেমন তা জানে না সে—স্বামী সম্বন্ধে শ্রদ্ধা গড়ে ওঠার অবকাশ পায় নি তখনও—বরং একটা অনুকম্পার ভাবই আছে। তবু ফুলশয্যা শব্দটি ঘিরে একটা স্বপ্ন প্রত্যেক বাঙালীর মেয়ের মনেই রচিত হয় কৈশোরের পূর্বাভাস থেকে। উৎপলারও তা ছিল। কিন্তু এই কি ফুলশয্যা?

ফুলের মধ্যে এল কাঠচাঁপার দু-ছড়া ছোট মালা—তাও গোড়ে নয়, এক-হালি, রমাই কোন রকমে গেঁথে দিলে। আর শয্যা? নতুন তো নয়ই, একটু ফরসা বিছানার কথাও কারুর মাথায় এল না। সেই কদিনের অসংখ্য-কুটুম্ব-অধ্যুষিত মলিন শয্যা এবং চিট্‌চিটে ময়লা বালিশেই বর-বধূর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি অতিবাহিত করার ব্যবস্থা হ'ল। কথাটা যে-কোন শহরের মেয়ে—তা সে যত গরীবই হোক—তার কাছে অবিশ্বাস্য। তবু শেষ মুহূর্তে, বোধ করি নতমুখী বধূর কঠিন দৃষ্টির দিকে চেয়েই রমার মনে পড়ে গেল, সে আর কিছুই হাতের কাছে না পেয়ে নিজের একখানা শাড়ী এনে ভাঁজ ক'রে পেতে দিলে বালিশ ও বিছানার ওপর।...

নিরীহ পাড়াগাঁয়ের অল্প-শিক্ষিত স্বামী—তবু দুটো চারটে কথা-বার্তার পর মনের ঔদাসীন্য ও অনুকম্পার ভাব যেন কেটে যায়। নিতাইয়ের সাধারণ বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা বরং ওর পরিচিত অনেকের

চেয়েই বেশী। শান্ত বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়। স্বামী হিসেবে ঠিক অবজ্ঞা করার মত নয়।

আরও কিছুক্ষণ পরে উৎপলা অবাক হয়ে দেখে নিতাইয়ের বাহু-বন্ধনের মধ্যে গিয়েও তো সে ঘৃণা বা অবজ্ঞায় শিউরে উঠছে না, বরং যেন কেমন ভালই লাগছে। ওর আদরে যে শিহরণ—তা পুলকেরই, একসময়ে নিজের মনের কাছেও স্বীকার করতে হয় উৎপলার। সে-ও দু'টো-একটা কথা কয়। আড়ি-পাতার ব্যাপার ছিল প্রথম রাত্রে, শেষ রাত্রে আত্মীয়ারা শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ায় ওদের কথাবার্তা সহজেই এগিয়ে চলে। এই আলাপ ও রাত্রিজাগরণে ক্রমে একটা আসক্তির ছোঁয়াচ লাগে।

উৎপলার মনের বিষও এই অবসরে বেরিয়ে আসে একবার। নিতাই একটু চুপ ক'রে থেকে উত্তর দেয়, 'দেখ স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের মনের মত না হয়—তাহলে ফুল আর শয্যার সমস্ত আড়ম্বরই ব্যর্থ হয় না কি? ভবিষ্যতে ঠিকমত মনের মিল না হ'লে বরং সেই আড়ম্বরের স্মৃতিটা উপহাস করতে থাকে। তুমি আর আমি, যদি আমরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে শয্যা নতুন হ'ল কি না হ'ল—ফুলের প্রাচুর্য রইল কি না রইল তাতে কী আসে যায়? বনবাসে সীতা দেবী তৃণ-শয্যাতে শুয়ে রামের বাহুকে উপাধান ক'রে যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে রাজবাড়িতেও সে তৃপ্তি পান নি। তাই নয় কি? তুমি তো অনেক পড়াশুনা করেছ!'

নিতাই কলেজে পড়েছে দু-বছর এটা শোনা থাকলেও, ঠিক এ-ধরণের কথা ওর কাছ থেকে আশা করে নি উৎপলা। এখন স্নেহ এবং শ্রদ্ধায় ওর মন যেন উপ্‌চে উঠল। ও একটু গাঢ়-কণ্ঠে বললে, 'তুমি একবার উঠে বসবে?'

নিতাই বললে, 'কেন বলো তো?'

'ব'সো না লক্ষ্মীটি!'

নিতাই মাথা তুলতে উৎপলা ওর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'তুমি আমাকে মাপ করো—এত ছোট কথা নিয়ে মনে ক্ষোভ রাখাই অন্যায় হয়েছিল আমার।'

ওকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে নিতাই সস্নেহে বললে, 'তুমি একটু পাগল আছ দেখছি।···তবে একটা কথা বলে রাখি, তুমি যখন এ বাড়িতে ঘর করতে আসবে, মানে একটু পুরোনো হবে, তখন তোমার বিছানা-বালিশ নিজের মনের মত ক'রে রেখো—কেউ কিছু বলবে না। এমন কি বাড়ির সবাইকার বিছানাই যদি পরিষ্কার রাখতে পার তো এরা কৃতজ্ঞই থাকবে। আসলে পেরে ওঠে না এরা, দেখছ তো মা-পিসীমার খাটুনি!'

নিতাইয়ের বুকে মাথা রেখে সুখে ও নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস ফেলে উৎপলা। আর কোন ভয় নেই ওর—স্বামীকে যে সে শ্রদ্ধা করতে পারবে এই জেনেই সে নিশ্চিন্ত।

ভোর বেলা সে সন্তর্পণে ঘরের দোর খুলে যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখনও উৎসব-বাড়ির কর্মক্লান্ত পরিজনরা কেউ ওঠে নি। ভাল ক'রে ফর্সাও হয় নি। সে নিঃশব্দে দালানের বিছানাগুলো বাঁচিয়ে ওপরের ছাদে উঠে গেল।

আঃ, কী শান্তি!

মাঠের সমুদ্র দিকচক্রবাল ছাড়িয়ে দূর থেকে দূরান্তরে কোথায় চলে গিয়েছে। পশ্চিম দিকের সুদূর দিগন্তে তখনও নক্ষত্র রয়েছে দু-একটি কিন্তু পূর্বদিকের আকাশ যেন ওরই সুখে আর লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে। মিষ্টি ঝির্‌ঝিরে ভোরাই হাওয়া ওর রাত্রি-জাগরণক্লিষ্ট তপ্ত কপোলে ঠাণ্ডা চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিল। তবু ঘুম এল না তখনও; বরং বিস্ফারিত নেত্রে সে প্রকৃতির এই অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনে হল মিষ্টি বাতাসের মধ্য দিয়ে ওর স্নেহপরায়ণ বাবারই হাতের মঙ্গলস্পর্শ ভেসে আসছে, তাঁর আশীর্বাদ বহন ক'রে আনছে এই ফুলের গন্ধ।

বাবাই ঠিক বুঝেছিলেন, তিনি ওর সত্যকার কল্যাণ চিন্তাই করেছিলেন। সে সুখী হবে এখানে—এই গৃহ, এই স্বামী, এই আত্মীয়-আত্মীয়াদের শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে, আপন বলে গ্রহণ করতে আর ওর কোন দ্বিধা নেই! যে জীবন সে পিছনে ফেলে রেখে এল তার জন্যও কোন ক্ষোভ নেই। ওর এই নতুন জীবনে ও সম্পূর্ণ সুখী।

মনে মনে সে বাবাকে প্রণাম জানালে।

আর প্রণাম জানালে পূর্বাকাশের দিকে চেয়ে অদৃশ্য ওর অদৃষ্ট দেবতাকে—যিনি পরম মাধুর্যে ওর জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে দিলেন।

মিলনান্ত

ফুলমাসিমারা যখন প্রথম আমাদের বাড়ির নিচেকার ঘরে ভাড়া আসেন তখন বেশীদিন যে তাঁহাদের রাখিতে পারিব, এ আশা আমাদের কাহারও ছিল না। সে অনেকদিনের কথা, এখন হইতে অন্তত দশ বৎসর আগে—কিন্তু একটু একটু করিয়া তাঁহারা রহিয়াই গেলেন, এবং এই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে সম্পর্কটা আজ এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা চলিয়া যাইবেন এ সম্ভাবনাই কাহারও মনে আসে না। এমন কি, যে চেঁচামেচি কান্নাকাটি প্রভৃতির জন্য প্রতিবেশীরা আমাদের উপর নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে আমরা যদি সাত দিনের মধ্যে অমন লক্ষ্মীছাড়া ভাড়াটেকে তাড়াইয়া না দিই তাহা হইলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন, তাঁহারাই সেই বস্তুটির অভাবে কাল আমাদের কাছে খোঁজ লইতেছিলেন, 'হ্যাঁহে, বাড়ি তোমাদের নিস্তব্ধ কেন? ফুলদি (কাহারও বা ফুলপিসিমা) কি চলে গেলেন নাকি?' কিম্বা 'ফুল বৌদির কি অসুখ করেছে নাকি হে? সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না যে?'

ইতিহাসটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি।

ঘরখানা আমাদের অন্দর মহলের মধ্যেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই বুদ্ধি করিয়া বাগানের দিকে তাহার একটা জানালার পরিবর্তে দরজা বসাইয়া সামনে একফালি রক বাহির করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। ঘরটা পড়িয়াই থাকিত, সুতরাং এই সামান্য খরচার বদলে ন'টা টাকা আয় বাড়িয়া যাইতে আমরা সকলেই খুশী হইলাম। ভাড়াটের সঙ্গে বন্দোবস্ত রহিল, তাঁহারা তোলা উনুন বাহিরে ধরাইয়া ভিতরেই রান্না করিবেন এবং বাগানের দিকের দরজাটা ব্যবহার করিবেন।

প্রথম যিনি ভাড়াটে আসিলেন তিনি এখানকারই পোস্টমাস্টার, মাস-নয়েক থাকিবার পরই কোয়ার্টার পাইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার নাকি এখানে অসুবিধা হইতেছিল। তার পরই আসিলেন ভবেশবাবু বা ফুলমাসিমারা। ভবেশবাবু কী একটা বড় অফিসে কাজ করেন, বেশ লেখাপড়া জানা অমায়িক ভদ্রলোক! জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে খুব দ্রুত আলাপ জমিয়া উঠিল, শ্বশুর-বাড়ির সূত্রে কী একটা কুটুম্বিতাও বাহির হইয়া পড়িল বুঝি—ফলে তখনই একেবারে একমাসের ভাড়া অগ্রিম লইয়া তিনি রসিদ লিখিয়া দিলেন।

সেইদিনই অপরাহ্ণে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। স্বামী আর স্ত্রী, মাত্র দুইটি লোক। পোস্টমাস্টারের মত একপাল ছেলে-মেয়ে যে আসিল না ইহাতেই আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম, যাক্ বাবা, বাঁচা গেল।

কিন্তু হায় রে! সে আশা যে আমাদের কত মিথ্যা তাহা বোঝা গেল তাঁহারা আসিবার দ্বিতীয় দিনেই। প্রথম দিনটা বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরেই ভবেশবাবু সংযত হইয়া ছিলেন, কিন্তু পরের দিন সন্ধ্যার পর তিনি অফিস হইতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে কী চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, কান্নাকাটি! তখন ছোট ছিলাম সব ব্যাপারটা বুঝি নাই—শুধু শুনিলাম ভবেশবাবু মাতাল হইয়া আসিয়া স্ত্রীকে মারধোর করিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম যে ইহার আগে এইসব কারণেই কোন বাড়ীতে পাঁচ-ছয় মাসের বেশি টিঁকিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক—ভবেশবাবুর মাতলামির বেশ একটা বিশেষত্ব ছিল। যেদিন পেটে একটু বেশী মদ পড়িত সেদিন বাড়ি ঢুকিতেন তিনি কাঁদো কাঁদো হইয়া। আসিয়াই বাজারের পুঁটুলিটা নামাইয়া 'মেজবউ' বলিয়া একটা হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রকের উপরই বসিয়া পড়িতেন। বলা-বাহুল্য ফুলমাসিমার এ সমস্ত লক্ষণই জানা ছিল—তিনি সে আর্ত আহ্বানে কর্ণপাত

মাত্র না করিয়া গম্ভীরভাবে বাজারের পুঁটুলিটা লইয়া ঘরে চলিয়া যাইতেন এবং যথারীতি নিজের কাজে মন দিতেন। কিন্তু ভবেশ মেসো ছাড়িবার লোক নন। তিনি তারও পরে 'মেজবৌ—ওফ্!' বলিয়া গোটা-দুই-তিন আর্তনাদ করিতেন, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া মাসিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিতেন। প্রথম বেগটা না কাটা পর্যন্ত শুধুই চলিত কান্না, সে ঝোঁকটা কাটিলে কথা ফুটিত। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতেন, 'মেজবৌ আমার হাতে পড়ে কী কষ্টই পেলে, একটা দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করতে পারলুম না। ওফ্!' কিম্বা 'মেজবৌ, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাকে বিষ এনে দাও—খেয়ে তোমাকে অব্যাহতি দিয়ে যাই। আর কত সহ্য করবে!' ইত্যাদি—

ইহার উত্তরে যদি-বা ফুলমাসিমা বলিতেন যে, না তিনি সুখেই আছেন, তাঁহার কোন অশান্তি নাই তাহা হইলেও অব্যাহতি ছিল না—ভবেশ মেসো প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেনই যে তিনি ফুল-মাসিমার অযোগ্য স্বামী। তিনি ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেন, 'মেজবৌ, তুমি আমাকে স্তোক দিও না—মেজবৌ, তুমি আমার মুখ চেয়ে মিথ্যে কথা বলছ—মাইরি বল্‌ছি বিশ্বাস করো আমি পিশাচ, আমি চামার, আমি জানোয়ারের অধম' ইত্যাদি।

এ সব ক্ষেত্রে বিরক্ত হইয়া ফুলমাসিমা হয়ত মানিয়া লইতেন যে মেসোমশায়ের কথাই ঠিক, তিনি পিশাচ, তিনি জানোয়ার—তিনি নিজে যাহা বলিতেছেন, তাহাই—তখন আবার চলিত অন্য আক্রমণ।

'মেজবৌ, তাই ব'লে মার্জনা কি নেই? তোমার পায়ে পড়ি এবারকার মত মাপ করো—আমি পশু, তুমি তো দেবী—এইবারটি মাপ করো—'

'মাপ করিয়াছি' বলিলেও নিস্তার নাই। 'মেজবৌ, সত্যি বলছ মাপ করেছ? মাইরি?······না, তোমার মনে রাগ রয়েছে। ওঃ,

কী করব রে? গলায় দড়ি দেব? আপিং খাব? মেজবৌ, কী হ'লে তুমি খুশী হও বলো, আমি তাই করছি।'

এ সব কথা শুনিতে ফুলমাসিমার ভাল লাগিত কিনা আমাদের ঠিক জানা নাই, তবে ফুলমাসিমা প্রত্যহই খানিকটা করিয়া এই প্রলাপ সহ্য করিতেন; তাহার পর ছাড়িতেন তাঁহার অব্যর্থ অস্ত্র। জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মাথায় এক বালতি জল ঢালিয়া দিতেন—ব্যাস্, যেন জেঁাকের মুখে নুন পড়িত। আর সে মানুষই নন। নিজেই মাথা মুছিয়া ঘরে আসিবেন, সহজ ভাবে কথা কহিবেন—শেষ পর্যন্ত হয়ত বা আমাদের ডাকিয়া গল্পই শুরু করিবেন।

কিন্তু বিপদ ছিল যেদিন পয়সা কম থাকিত বা কোন কারণে বেশী মদ খাওয়ার ইচ্ছা হইত না, সেই দিনই। বাড়ি ফিরিতেন একেবারে রুদ্রমূর্তিতে। জিনিস-পত্র ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া, ফুলমাসিমাকে গালাগালি দিয়া বাড়ি যেন মাথায় করিতেন। তাহার পর ফুলমাসিমা কোন জবাব দিন বা না দিন, কোন একটা ছুতা ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রাণপণে ঠেঙাইতেন; প্রথম প্রথম দুই একদিন আমাদের বাড়ির মেয়েরা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন (কারণ সে সময়ে আমাদের বাড়ির পুরুষরা প্রায় কেহই বাড়ি থাকিতেন না) কিন্তু ভবেশবাবুর রুদ্রমূর্তি দেখিয়া আর কেহ কাছে যাইতে সাহস পান নাই। ইদানীং আবার তাঁহাকে ঐ ভাবে ফিরিতে দেখিলেই ফুলমাসিমা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতেন।

তবে ভরসার কথা এই যে, ফুলমাসিমাকে খানিকটা মারিবার পর আপনা আপনিই তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিত। নিজেই কলতলায় গিয়া মাথায় জল দিয়া আসিতেন, ফুলমাসিমার পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়া লইতেন, তাহার পর বাহিরে গিয়া ব্র্যাণ্ডি কিংবা-কেরোসিন

তেল সংগ্রহ করিয়া একটা মাল্‌সাতে গুলের আগুন করিয়া মাসিমার কাল্‌সিটা পড়া জায়গাগুলিতে মালিশ ও সেক করিতে বসিতেন। তারপর সারারাত ধরিয়া চলিত মাসিমার সেবা ও তোয়াজ। সে মানুষই নয় আর। এমন কি মাত্রাটা যেদিন একটু বেশী হইয়া পড়িত সেদিন হোটেলে গিয়া মাসিমার জন্য চপ্‌-কাটলেটও কিনিয়া আনিতেন।

অবশ্য এ তো গেল ভিতরের কথা—কিন্তু পাড়ার লোকে এ সব ইতিহাসের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা শুনিতেন শুধু ঐ চেঁচামেচি কান্নাকাটি। ফলে তাঁহারা অত্যন্ত গোলমাল শুরু করিলেন, একদিন তিন চার জনে মিলিয়া আমাদের জানাইয়াই গেলেন যে সাত দিনের মধ্যে এই লক্ষ্মীছাড়া মাতাল ভাড়াটে উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। বাড়ির লোকরাও যে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয় কিন্তু বিপদ বাধিয়াছিল ফুলমাসিমাকে লইয়া, তিনি দুই তিন দিনের মধ্যেই এমন ভাবে সকলের অন্তরঙ্গ ও প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কল্পনাও হইয়া উঠিল কষ্টকর। মা-তো নিজের বোনের মতই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্যাঠামশাই তাঁহাদের উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেই তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিত। আর শেষ পর্যন্ত পাড়ার লোককে ফুলমাসিমাই ঠাণ্ডা করিলেন। নিজে যাচিয়া বাড়ির মধ্যে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পুরুষরাও কেহ তাঁহার ভাই, কেহ বোন-পো, কেহ বা বাবা হইয়া উঠিলেন, সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের তাড়াইবার কথাটা আপনিই চাপা পড়িয়া গেল।

ফুলমাসিমার কথাবার্তায় সব চেয়ে যেটা বিস্ময়কর ছিল সেটা স্বামী সম্বন্ধে তাঁহার সহজ মনোভাব। ভবেশবাবুর ব্যবহারে তাঁহার

যে কোন লজ্জা পাইবার কারণ আছে, অন্য মেয়েরা কেহ যে এ ব্যাপারে তাঁহাকে করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারে—এ কথাটা একবারও তাঁহার মাথায় যাইত না। বরং কেহ সেই ধরণের কথা তুলিলে তিনি যেন একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাহার দিকে তাকাইতেন। অপরপক্ষ তাহাতেও নিরস্ত না হইলে তিনি নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন।

একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। দুপুর বেলা মেয়েদের আড্ডা বসিয়াছে, ছেলেমানুষ বলিয়া আমরাও সেই ঘরে আছি, কেহ নিষেধ করে নাই। তাহার আগের দিন রাত্রে ভবেশ মেসো একটু বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহার ফলে আজ সকালে আর ফুলমাসিমা উঠিতে পারেন নাই, অনুতপ্ত মেসোমশাই নিজেই রান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া গিয়াছেন—সেই কথাটাই মাসিমা সগর্বে গল্প করিতেছিলেন। আমার মা শুনিতে শুনিতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, 'তুই থাম ফুল! ও কথা আর বাহাদুরি ক'রে গল্প করিস্ নি। তুই বলে তাই ঐ জানোয়ারটার ঘর করিস, আমি হ'লে অমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম!'

মা সাধারণত এ ধরণের কথা কখনও ফুলমাসিমাকে বলিতেন না—সেদিন বোধ হয় অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আর নিজেকে সামলাইতে পারেন নাই, কিন্তু মাসিমা এই রূঢ়তায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ বিবর্ণ মুখে বসিয়া থাকিবার পর বার-দুই ঢোঁক গিলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ভালবাসে বলে তাই, আপনার বলে তাই, নইলে কে কাকে মারে দিদি!'

তাহার পর আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নিচে চলিয়া গেলেন।

মা-তো কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেনই—ঘর সুদ্ধ সকলেই আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন। আমরা সকলেই ভাবিলাম যে

ফুলমাসিমা বোধ হয় কিছু দিন আর আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন না। কিন্তু দেখিলাম যে স্বামীর অপরাধ সহজে ক্ষমা করার অভ্যাস থাকায় সমস্ত অপরাধই তিনি ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। একটু পরেই কী একটা ছুতায় তিনি উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবেই কথাবার্তা শুরু করিয়া দিলেন। আমরা সকলেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম ; যদিও সেইদিন হইতে মা বা আমাদের বাড়ির অন্য কেহ ভবেশ মেসো সম্বন্ধে আর কোন কটূক্তি তাঁহার কাছে করেন নাই। যে মানুষ কাহাকেও কখনও আঘাত ফিরাইয়া দেয় না, তাহার নিঃশব্দ বেদনার কারণ হইয়া লাভ কি ?

এ হেন ফুলমাসিমার সংসার কয়দিন হইতে নিস্তব্ধ হইয়া আছে। বিস্ময়ের কথা বৈ কি! ব্যাপারটার কারণ সম্বন্ধে অতি সন্তর্পণে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানা গেল তাহা আরও বিস্ময়কর। ভবেশ মেসো মাতাল হইয়া যাহাই করুন না কেন, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি ফুলমাসিমাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে আমরা কখনও তাঁহাকে মাসিমার কথায় প্রতিবাদ করিতে তো শুনিই নাই—কখনও তাঁহাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে এমনও শুনি নাই—হঠাৎ সেদিন কি একটা ব্যাপারে, বোধ হয় বাজার যাওয়া লইয়াই, দুজনের একটু মনান্তর হইয়াছিল এবং মেসোমশাই একটু চড়া গলায় কী জবাব দিয়াছিলেন। তাহার ফলে মাসিমা মুখ অন্ধকার করিয়া ছিলেন এবং বাজার হইতে ফিরিবার পরে কথা কহেন নাই, এমন কি আহারের সময়েও প্রশ্ন করেন নাই আর কিছু চাই কি না। ফলে ভবেশবাবু যখন অফিসে যান তখন খুবই মুহ্যমান অবস্থাতে বাহির হইয়াছিলেন।

এদিকে ফুলমাসিমার আশা ছিল যে, সেদিন ভবেশবাবু একটা ভাল রকমের কিছু উপহার লইয়া বাড়ি ঢুকিবেন এবং সন্ধির প্রস্তাব স্বরূপ মদ না খাইয়া ফিরিবেন। কিন্তু ভবেশবাবু সে সব কিছুই

করেন নাই, অফিসের বেয়ারা দিয়া খবর পাঠাইয়াছেন যে তিনি দিন তিনেকের ছুটি লইয়া তাঁহার দাদার কাছে আসানসোল চলিয়া যাইতেছেন—ফুলমাসিমা যেন না ভাবেন।

কথাটা সামান্য, কিন্তু সংবাদটা শুনিবার পর ফুলমাসিমার মুখের যে অবস্থা হইল তাহা অবর্ণনীয়। তিনি দুঃখিত হইয়াছেন, কিম্বা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা বিরহ কিম্বা ক্ষোভ কিছুই বোঝা গেল না, শুধু অপরিসীম একটা বেদনার ছবি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রি তো তিনি রান্না করিলেনই না, মায়ের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে আমাদের এইখানেই সামান্য কিছু মুখে দিলেন মাত্র—পরের দিনও তাঁহার সে দিকে কোন চেষ্টা দেখা গেল না। মা অবশ্য নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই আর এ কদিন রাঁধিস নি ফুল, ভবেশ যতদিন না আসে আমার এখানেই খাস।' ফুলমাসিমা তখন একবার বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইলেন, কোন জবাব দিলেন না, প্রতিবাদও করিলেন না। কিন্তু সেদিন আহারে বসিয়া কিছুই খাইলেন না, খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বলা বাহুল্য এতটা বাড়াবাড়ি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত খারাপ লাগিল। ফুলমাসিমা কচি খুকী নহেন, ভবেশ মেসোরও চল্লিশ পার হইয়াছে। তা ছাড়া তাঁহারা নাকি একুশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছেন, এ অবস্থায় স্বামী যদি দুই দিনের জন্য বাহিরে গিয়াই থাকেন তো হা-হুতাশ করিবার কি আছে! মা কিন্তু—মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবারই চেষ্টা করিলেন—কাকিমা বৌদির দল আড়ালে হাসাহাসি করিতে লাগিলেন প্রচুর।

কিন্তু বিরক্তিটা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল ফুলমাসিমার রকম দেখিয়া। মেয়েলি ভাষায় 'আদিখ্যেতা'র একটা সীমা থাকা দরকার। অন্য দিন বারোটা বাজিলেই নিজের কাজ সারিয়া ফুলমাসিমা উপরে আসিয়া মেয়ে-মজলিসে যোগ দিতেন, বেলা চারিটার আগে আর নিচে নামিতেন না—ঘুম পাইলে উপরেই কোথাও পড়িয়া গড়াইতেন।

অথচ আজ, উপরেই খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, কোনমতে থালার কাছ হইতে উঠিয়া একেবারে নীচে নামিয়া গেলেন এবং সারাদিন আর ঘর হইতে বাহির হইলেন না। একেবারে সন্ধ্যার পর মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় কাচিয়া যখন উপরে চা খাইতে আসিলেন তখনও মুখ তেমনি থমথমে, তেমনি উদাস। চা খাওয়া হইয়া গেলে খালি পেয়ালাটা হাতে নাড়াচাড়া করিতে করিতে অস্বাভাবিক রকম মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, 'দিদি একটা কথা বলব ?'

মা একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'অত ভণিতা ক'রে আবার কি বলবি ?'

'আজ আর আমার আটা মেখো না দিদি, আমার একদম খিদে নেই। আমার—আমার শরীরটা বড় খারাপ করছে ?'

ইহার পর আর মায়ের ধৈর্য রাখা সম্ভব হইল না। এতদিনে ঘনিষ্ঠতাটা প্রায় আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মা আর ইদানীং কথা বিশেষ হিসাব করিয়া বলিতেন না। আজও মুখে লাগাম রাখিলেন না। একেই অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য পাড়ার মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল, তাহার উপর দুইদিন ধরিয়া মনের মধ্যে রোষ ধূমায়িত হইয়া আজ সকল ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করিল। তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া যখন থামিলেন তখনও কিন্তু ফুলমাসিমা একটি প্রতিবাদের কথা উচ্চারণ করিলেন না, বা উঠিয়াও গেলেন না, শুধু তাঁহার দুই চোখ প্লাবিয়া গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মা সেই জল দেখিয়াই হউক বা নিজের রূঢ়তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই হউক—হঠাৎ অত্যন্ত কোমল হইয়া পড়িলেন, কাছে বসিয়া মাসিমাকে একেবারে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, 'কেন অমন কচ্ছিস বল্ দেখি ফুল ?—সত্যি কথা বলবি।'

এবার ফুলমাসিমা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। মায়ের গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বুকে মুখ রাখিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে

লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিজেই একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, 'যা ভাবছ দিদি তা নয়। এ আমার কপাল পোড়ার কথা যে! আমার আর কি কিছু ভাল লাগছে?'

'সে কি রে? কী বল্‌ছিস্‌ পাগলের মত!'

'ঠিকই বলছি দিদি'—আর একবার কান্নার জোয়ার আসিল—'এতদিন বিয়ে হয়েছে দিদি, মারুক আর ধরুক, যাই করুক—আমি সত্যি রাগ করেছি বুঝতে পারলে ও তুই চোখে অন্ধকার দেখত—পাগলের মত চেষ্টা করত যাতে আমার রাগ ভাঙ্গে, যাতে আমার মুখে একটু হাসি ফোটে—। যতক্ষণ না আমি আবার হেসে কথা কইতুম, ততক্ষণ যেন জ্ঞান থাকত না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দিদি, যত মাতালই হোক্‌ না কেন, আমি বিরক্ত হচ্ছি বুঝতে পারলে ওর নেশা পর্যন্ত ছুটে যেত! আর সেই লোক কিনা, আমি মুখ ভার করে আছি দেখেও স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে গেল, কেন রাগ করলুম একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না, উল্‌টে একটা চাকর দিয়ে চিরকুট পাঠিয়ে সটান বিদেশ চলে গেল। কী বলছ দিদি, আমার বুকের মধ্যে যে কী আগুন জ্বলছে তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। অত সাহস ওর আসে কোথা থেকে, অন্যদিকে যদি টান না থাকবে?'

শেষের কথাগুলি আবার কান্নায় জড়াইয়া গেল। মা যে কী কষ্টে গম্ভীর হইয়া রহিলেন তা তিনিই জানেন। কোনমতে কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা টানিয়া আনিয়া কহিলেন, 'এই কথা! পাগলী কোথাকার, আমি বলি না জানি কি! এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছিস ফুল। শোন্‌, মুখ তোল্‌, আমার দিকে চা—ওরে, আমার ঢের বয়স হয়েছে, অনেকদিন ধরে এই এত বড় সংসার চালাচ্ছি, লোকও দেখলুম ঢের—আমি বলছি তোর কপাল অত সহজে পুড়বে না, ভবেশ সে রকম লোক নয়। তোর ওপরে ওর যা ভালবাসা, সে কি এতই ঠুন্‌কো ভাবিস?···আ আমার কপাল, এতদিনেও স্বামীকে বিশ্বাস করতে শিখলি না।'

ফুলমাসিমার ললাটের মেঘ কাটিয়া যেন নিমেষে এক ঝলক আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'তুমি সত্যি কথা বলছ দিদি, আমার ভয় নেই? না, আমাকে স্তোক দিচ্ছ?'

'না রে, সত্যি বলছি।'

'তবে ও অমন করলে কেন?'

'সে যখন তোদের ঝগড়া মিটে যাবে তখন তাকেই জিজ্ঞেসা করিস!'

আবারও ফুলমাসিমার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। বলিলেন, 'তা ঝগড়াই বা করলে কেন দিদি, এতদিনের মধ্যে ত কখনও আমাদের মনান্তর হয় নি!'

মা কোনমতে ঠোঁট কাম্‌ড়াইয়া মুখভাব শান্ত রাখিলেন। বলিলেন, 'ওকে কি মনান্তর বলে রে পাগ্‌লী? ও হ'ল ঠোকাঠুকি লাগা! নে, নে, ওঠ,—ময়দাটায় জল দে দিকি, কাজ কর্।'

ফুলমাসিমা উঠিলেন বটে, সেদিন আহারও করিলেন স্বাভাবিক ভাবেই, কিন্তু তাঁহার মনের দ্বিধা বা সংশয় যে একেবারে কাটে নাই, তা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। কথার ফাঁকে ফাঁকে অকারণ দীর্ঘশ্বাস তাঁহার পড়িতেই রহিল।

হঠাৎ সে মেঘ কাটিল আরও দুই-দিন পরে। একটা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে ঘুম ভাঙিয়া দেখি ভবেশবাবুর সহিত একটি প্রায়-প্রৌঢ়া মহিলা নামিতেছেন, সঙ্গে গুটি-দুই ছেলেমেয়ে। আরও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে চিনিতেও পারিলাম, ইনি ভবেশবাবুর বৌদি—আসানসোলে থাকেন, এতকালের মধ্যে বছর-পাঁচেক আগে একবার মাত্র আসিয়াছিলেন দিন-কয়েকের জন্য।

ভদ্রমহিলা গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে ফুলমাসিমাকে বুকে জড়াইয়া রহিলেন। সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, 'বুড়ো বয়স পর্যন্ত বুঝি তোদের পাগলামি ঘোচে না। কী বলেছিলি ওকে?'

কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে ফোটে। অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে মাসিমা বলেন, ‘কী বলেছি ?’

‘তা জানি নে বাপু। গিয়ে বলে, লাইফ-ইন্সিওরের টাকা ক’টা তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরাই ওকে দেখো, এই আমার ব্যাঙ্কের বই, এই সব কাগজপত্র—আমি আর এসব কিছু জানি না, আমি আত্মহত্যা করব—’

ফুলমাসিমা জায়ের আলিঙ্গনের মধ্যেই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বৌদি কহিলেন, ‘হ্যাঁ, শোন্ না। সে কিছুতে থামাতে পারি না, বলে, আর আমি কিছুতেই এ জীবন রাখব না, আমি মরবই। যত বলি, ব্যাপার কি, সব খুলে বলো, তত ঐ এক কথা, ওকে তোমরা দেখো, আর তো কেউ নেই, মোদ্দা আমি মরবই।······অনেক মাথার দিব্যি দেবার পর শুনি যে, তুই নাকি শুধু শুধু ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস, আবার ওর ওপরই রাগ ক’রে মুখ ভার ক’রে আছিস—এমন কি ভাত দিয়ে একবার খোঁজ পর্যন্ত করিস নি যে, আর কিছু ওর চাই কিনা—এই বাবুর একেবারে মাথায় আগুন জ্বলে গেছে,—এ ছার প্রাণ আর রাখব না ! ঠাণ্ডা করতে কি পারি—কোন কথা শুনতে চায় না।······যত সব পাগলের কাণ্ড ত, কী ক’রে বসবে তা কি জানি, তাই আবার নিজেকে আসতে হ’ল। নাও ভাই, তোমার জিনিস বুঝে নাও, আমার সেখানে ঘর-কন্না সব আতান্তরে ফেলে এসেছি !’

এতক্ষণে মেঘ সত্য-সত্যই কাটিল। কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম কোপ টানিয়া আনিয়া স্বামীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া হাসিহাসি মুখে ফুলমাসিমা কহিলেন, ‘আহা, ন্যাকামি !’

জীবনের মূল্য

পুরো চল্লিশ টাকার বই রহমান মিয়াকে ধরে দিয়ে যখন হাত পেতে মাত্র আটটি টাকা নিতে হ'ল তখন কোন্ অনুভূতিটা সুরেনের বড় হয়ে উঠেছিল, লজ্জা না আত্মগ্লানি, সেটা বলা শক্ত। হয়ত বা দুটোই—কিন্তু সেটা তখন বিচার করে দেখবার মত অবস্থা ওর ছিল না। রহমানের এই পুরোনো বইয়ের দোকানটি বহুকালের, সে মানুষ চেনে—সুরেনকে ওর দোকানের পিছনদিককার দোরটা দেখিয়ে দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, 'চলে যান বাবু, আবার কে এসে যাবে, তখন লজ্জায় পড়বেন।'

লজ্জায়! তা বটে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে পিছনের সেই সংকীর্ণ দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে এল। এ দোকানের এইটিই বিশেষত্ব। একটি মাত্র প্রবেশ-পথ নয় এর। আর এইজন্যই নাকি রহমান অনেক টাকা ভাড়া দিয়ে ঘরটি রেখেছে। বইয়ের দোকানের যে সব কর্মচারী মনিবের বই চুরি করে বেচতে আসে তাদের প্রায় সকলেরই এই পথটি জানা আছে, সেইজন্য তারা অন্য কোথাও যায় না। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা এ গলিতে কম।

রাস্তায় পড়েও সুরেন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, অভিভূতের মত, প্রস্তরীভূত কোন পদার্থের মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বই—ওর মনিব কমিশন পেয়েছেন কেনবার সময় মাত্র শতকরা পাঁচ টাকা, তাও নগদ নয়, কতকগুলি বস্তাপচা অচল বই। বিক্রী হ'লে সেল্‌স্ ট্যাক্স সুদ্ধ ওর দাম চল্লিশ টাকার বেশীই হ'ত—আর ও পেলে মাত্র আটটি টাকা। এই সামান্য টাকার জন্য মনিবের পাঁচগুণ বেশী ক্ষতি করলে ও।

অথচ, ঈশ্বর জানেন, বাধ্য হয়েই এ কাজ ওকে করতে হয়েছে। সে লেখাপড়া শেখে নি, সামান্য বেতনে বই-এর দোকানে কাজ করে বটে, তবু সে যে ভদ্রসন্তান একথাটা কোনদিনই ভুলতে পারে না। তাই ওর আশেপাশে যারা কাজ করে তারা এবং এই অঞ্চলে যত বই-এর দোকান আছে প্রায় সব দোকানেই কোন না কোন কর্মচারী যে চুরি করে, তা স্বুরেনের জানা থাকা সত্ত্বেও সে ও-কাজটা করতে পারে নি আজ পর্যন্ত। এমন কি তারা কিভাবে জামার মধ্যে ক'রে, পেটকাপড়ের মধ্যে গুঁজে, কিংবা শীতকালে গায়ের কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে বই সরায় তা সবই স্বুরেন জানে, কোন্ বই-এর কত দাম পায় সে হিসেবও ওর অজানা নেই। তবু সে নিজে পারে নি এতদিন। অবশ্য যারা এ কাজ করে তাদের যে ও দোষ দেয় তা নয়—যে সব মনিবরা এই বাজারে কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশ টাকা দিয়ে কর্মচারী রাখেন এবং দিনে আট-দশ ঘণ্টা খাটান, তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই চুরিকে প্রশ্রয় দেন, এমন কি চুরি করতে বলেন, এই ওর বিশ্বাস। যে টাকাতে আজকাল একটা লোকেরই খাওয়া পরা চলে না, সে টাকাতে তাদের সংসার চলছে—এই কি ওঁরা আশা করেন?

যুদ্ধের স্বুযোগ নিয়ে সকলকারই আয় বেড়েছে। মনিবরা বই-এর দাম বাড়িয়েছেন ছাপা কাগজের ব্যয়-বাহুল্যের দোহাই দিয়ে। প্রেসে যারা কাজ করে তারাও দর বাড়িয়েছে; আর তা না বাড়ালেও—ওরা বাড়তি কাজ করলেই বাড়তি টাকা পায় চিরকাল। কিন্তু স্বুরেনদের কি? ডিসেম্বর জানুয়ারী নাগাদ প্রায় আড়াই মাস ধরে প্রত্যহ অন্তত বারো ঘণ্টা ক'রে খাটতে হয়। তার দরুণ বাড়তি কিছু পায় কি? কিছু না। কর্তারা বলেন যে, 'অন্য সময় তো ওরা পড়ে পড়ে ঘুমোয়, এখন একটু না খাটলে চলবে কেন?' তবু স্বুরেনের মনিব তো ভাল, এ অঞ্চলে সবাই ওঁর স্বুখ্যাতি করে, তিনি কিছু কিছু দেন—অনেক দোকানে এক পয়সাও উপরি পাওয়া যায় না। স্বুরেনরা পায় ঐ সময় দু-কাপ চা এবং একখানা টোস্ট্ আর দু আনা ক'রে জলপানি।

এ-ছাড়া বছরে ঐ খাটুনিটার বকশিশ হিসাবেই আধমাসের মাইনে বোনাস্‌।

কিন্তু তাতে কতটুকুই বা হয় ? এধারে তো উপরি নেই-ই, বাইরে যে কোথাও কিছু বাড়তি উপার্জন করবে তারও উপায় নেই। রাত আটটা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে, হিসাব মিটিয়ে বেরোতে বেরোতেই সাড়ে-আটটা ন'টা বেজে যায়। আর কীই বা করা সম্ভব ! এমন কি একটা টিউশনি করারও সময় থাকে না। অত রাত্রে কে পড়বে ? বেশী লেখাপড়া তারা জানে না সত্য কথা, কিন্তু একেবারে নিচু ক্লাসের ছেলেমেয়েকেও তো পড়াতে পারত, আর তাতে কিছু না হোক—এখনকার দিনে পাঁচটা টাকাও অন্তত পেত সে ! দরিদ্রের কাছে পাঁচটা টাকার মূল্যই কি কম ! শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত দু-কাপ চা আর একটা টোস্ট্‌ খেয়ে থাকে, তবু ভরসা ক'রে জলপানির দু-আনা পয়সা খরচ করতে পারে না। প্রতিদিন দু-আনা জমলে মাসে তিন টাকা সওয়া তিন টাকা জমে (রবিবারগুলো বাদ যায়) ! তাই কি কম ? ওদের মনিবের ছেলে অমূল্যবাবু মধ্যে মধ্যে বলেন, 'জলখাবার তো কেউই খায় না—মিছিমিছি বাবা কেন যে ওটা দেন তা জানি না !' হায় রে, কেন যে এই ক্ষিদেটা ওরা চেপে থাকে তা ভাববার চেষ্টাও করেন না ওঁরা !

রাস্তার লোক ঐভাবে সুরেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়েই তাকাচ্ছিল। একজন খুব কাছে এসে মুখটা ভাল ক'রে দেখে গেল ! ফলে সুরেন যেন তন্দ্রা ভেঙে নড়ে-চড়ে উঠল, আস্তে আস্তে গলিটা থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোড পার হয়ে শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ধরে গিয়ে পড়ল গোলদীঘিতে। ঘরে অসুস্থ সন্তান, উপবাসী স্ত্রী পথ চেয়ে আছে, রাতও ওধারে ন'টা বেজে গেছে, তবু কিছুতেই সুরেনের বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। কোনমতে ক্লান্ত পা দুটোকে

টেনে নিয়ে গিয়ে জনহীন গোলদীঘির একটা বেঞ্চে বেসে পড়ল। সে চোর, সে চুরি করেছে সেইটেই বড় কথা নয়—সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মনিব যে তাঁর আর সব কর্মচারীর চেয়ে তাকে বেশী স্নেহ করেন এবং বিশ্বাস করেন, তার প্রমাণ বার-বারই পেয়েছে ও। আজ তার ভাল রকমই শোধ দিলে সুরেন!

অথচ আর কীই বা করতে পারত সে?

ছেলেমানুষের মতই নিজেকে সে বারবার সান্ত্বনা দিতে লাগল। সে লেখাপড়া শেখে নি, কেন শেখে নি তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। আজকের এই পরিণতিটা সেদিন কিছুতেই বিশ্বাস করে নি বলেই বোধ হয়—সে বাবার তিরস্কার এবং মায়ের সস্নেহ অনুযোগ উপেক্ষা করে ইস্কুল পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে পেরেছিল। ফলে ওর দাদা এবং ছোট ভাই দুজনেই যথাসময়ে বাবার সরকারী অফিসে ঢুকে গেল, কিন্তু ও পারল না। তবু বাবা তখনও বেঁচে ছিলেন এবং ভাল মাইনে পেতেন বলে ওর কোন অসুবিধাই হয় নি—এমন কি সে অম্লানবদনে বর সেজে বিয়ে করতেও গিয়েছিল। শুধু বিয়ের পর যখন একটি সন্তান হ'ল তখন তার জন্য দুধের খরচাও বাবার কাছে চাইতে লজ্জা বোধ হওয়ায় ও অনেক ঘুরে এই চাকরীটি সংগ্রহ করেছিল। সে হ'লও অনেক দিনের কথা—বছর দশ-বারো হবে। তখন মাইনে ছিল মাত্র পঁচিশটি টাকা। তারপর অবশ্য ও অনেক উন্নতি করেছে, মনিব সবচেয়ে ওকেই বিশ্বাস করেন, ও-ই নাকি বেশী কাজের লোক, 'কাউণ্টারে' সুরেন না থাকলে চলে না, খদ্দেররা এসে সকলে সুরেনকেই খোঁজে—কিন্তু তবু বই-এর দোকানে কতটুকুই বা মাইনে বাড়া সম্ভব? বারো বছরে ওর মাইনে এসে দাঁড়িয়েছে চল্লিশটি টাকায়—তা-ই সে দোকানে অত বেশী মাইনে নাকি কারুর নেই! এতেই সবাই সুরেনকে হিংসে করে।

কিন্তু এই পনেরো টাকা মাইনে বাড়তে বাড়তে এধারে অনেক ওলট্-পালট্ হয়ে গেছে। বাবা অফিস থেকে রিটায়ার করলেন;

তাতে একটু টানাটানি হ'ল বটে তবু অচল হয় নি। তারপর হঠাৎ তিনি মারা গেলেন—জিনিসপত্র মহার্ঘ হ'তে হ'তে চারগুণ পাঁচগুণ দামে এসে দাঁড়িয়েছে, সংসার কিছুতেই যেন চলে না। ঠিক সেই সময়েই দাদা এবং ছোট ভাই সাবধানে চক্ষুলজ্জা বাঁচিয়ে পৃথক হয়ে গেল। দাদা তদ্বির ক'রে অফিস থেকেই মিলিটারী য়্যাকাউন্টস্-এ বদলী হয়ে মীরাট চলে গেলেন, শুধু দয়া ক'রে মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আর ছোট ভাই বড় বাড়ী ছেড়ে দেবার অজুহাত দেখিয়ে সহসা একদিন একটা ছোট ফ্ল্যাটে উঠে গেল, যাবার সময় প্রশ্নও করল না মেজদার কী হবে। অবশ্য তাকেও দোষ দেয় না সুরেন, তার যা বেতন তাতে তার সংসার চালানোই কঠিন, এখনকার দিনে অত বিবেচনা করতে গেলে চলে না। যাই হোক্—সুরেন কিন্তু একেবারে চোখে অন্ধকার দেখল। অনেক খুঁজে কেরাণীবাগানের এই অন্ধকার ঘরটি দশ টাকা দিয়ে ভাড়া ক'রে উঠে এল সে, জিনিসপত্র যা ধরল সে ঘরে তাই রেখে বাকী বেচে দিল। হাতে কিছু নগদ টাকা থাকা ভাল—বোধ হয় এই ছিল তার মনের ভাব।

কিন্তু তারপরই এল মন্বন্তর। চাল পাওয়া যায় না, চিনি পাওয়া যায় না—আটা নেই। কন্ট্রোলের দোকানে দাঁড়াতে গেলে অফিসের সময় থাকে না, চোরা-বাজারে কিন্‌তে গেলে চতুর্গুণ দাম দিতে হয়। তাছাড়া আর কিছু করতেও পারে না, ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—তাদের দ্বারা কোন সাহায্য হয় না। জিনিস বিক্রির টাকা গেল, স্ত্রীর গায়ে যা দু-একখানা অলঙ্কার ছিল তা গেল—শেষে ঘটি-বাটিগুলোও যেতে শুরু হ'ল একে একে। মনিবদের কাছে প্রার্থনা জানাতে তাঁরা আরও আধ মাসের টাকা বোনাস দিলেন, বললেন, এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে, তাঁদেরও ব্যয় বহুগুণ বেড়ে গেছে! অথচ তাঁদের তো আর যুদ্ধের চোরাই পয়সা নয়; বই একটু বেশী বিক্রি হচ্ছে বটে কিন্তু অনুপাতে কি ব্যয়টা

আরও বেশী নয় ?…তা বটে, মানতেই হয় কর্মচারীদের। অন্য অফিসে চাল-ডাল দেবার ব্যবস্থা হ'ল, ওদের সে উপায়ও নেই। ওদের এমন একটা সমিতিও নেই যে একসঙ্গে মিলে প্রতিবাদ জানায়। চাকুরী ছেড়ে দেবারও ভরসা নেই—এই বুড়ো বয়সে হাতের কোন কাজ শিখে যুদ্ধের কাজে লাগা কি সম্ভব হবে? তারপর—যুদ্ধ যখন থামবে তখন ?

মনিবদের কী একটা সমিতি আছে, প্রকাশক-সভা না কি! সেখানে নাকি হাজার হাজার টাকা পড়ে আছে ; ওরা সেখানে একটা দরখাস্ত দিয়েছিল কিছু সাহায্যের জন্য, কিন্তু তাঁরা তা দেন নি। তাঁরা ইচ্ছা করলে অন্ততঃ গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে কিছু চাল-ডাল আদায় ক'রে দুর্ভিক্ষের সময় একটু সস্তাদামে দিতে পারতেন, যেমন রেল-অফিসে বা কোন কোন কারখানায় করেছিল। হয়ত তাঁরা ব্যবস্থা করলে মনিবরাও অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিছু কিছু চাঁদা দিতে পারতেন। কিন্তু তা দেওয়া সম্ভব হয় নি। প্রকাশক-সভার বাড়ী হবে, তার জন্য টাকা জমছে! মনে পড়লেও হাসি পায় সুরেনের, এই ক'টা বইয়ের দোকান নিয়ে প্রকাশক-সভা, তার আবার বাড়ী! যে সভা তার সভ্যদের এমন আপৎকালেও বাঁচাতে পারে না—তাদের সভা থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি ? ওর এক মাসতুতো ভাই, কলকাতার এক বড় ইস্কুলে সামান্য মাস্টারি করে, তার মুখেও এমনি একটা কথা শুনেছিল ও। তখন বোমা পড়ার হিড়িক, ইস্কুল প্রায় বন্ধ, অথচ জিনিসের দাম, বেড়েই চলেছে। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ মাস্টারদের মাইনে কমিয়ে শতকরা কুড়ি-টাকায় দাঁড় করালেন তবু বাড়ী-তৈরীর তহবিলে যে ছিয়াত্তর হাজার টাকা জমেছিল, বর্তমান ইস্কুলের কাছাকাছি জমির অভাবে সে বাড়ী তৈরীর সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত জেনেও, তা থেকে কয়েক হাজার টাকা খরচ ক'রে সে দুর্দিনে বা তার পরে দুর্ভিক্ষের সময় মাস্টার মশাইদের বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি তাঁরা।

যাক্ গে—ওসব বাজে কথা ভেবে লাভ কি !

'বিবেকের দংশন' যাকে বলে সাধু বাংলায়—তাই কি আজ অনুভব করছে ও ? কিন্তু—না, সুরেন জোর ক'রে বললে মনে মনে, না—বিবেক ওর পরিষ্কার আছে। যতদিন একটি পয়সারও সংস্থান করতে পেরেছে সে, ততদিন এক কড়া-ক্রান্তিও চুরি করে নি। আজ তার ঘরে খাবার মত একটা পেতল-কাঁসার বাসন নেই ; স্ত্রীর দামী শাড়ী সবগুলি বিক্রি হয়ে গেছে ; তার আর ছেলেমেয়েদের কতকগুলো গরম কোট ছিল (ওর বাবার আমলের), তাও আর অবশিষ্ট নেই। আত্মীয়-স্বজনরা প্রায় সবাই দরিদ্র, তবু তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা সাহায্য করেছে তারা। বন্ধু-বান্ধব, এমন কি ওর অফিসের হিন্দুস্থানী চাকর মন্নু, তার কাছেও ধার করতে বাকী রাখে নি। এখন এমন দিন এসেছে যে আর কোথাও কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ বাড়িতে দু'টি সাংঘাতিক রোগী—বড় ছেলেটির টাইফয়েড, মেজ মেয়েটির রক্ত-আমাশা। স্ত্রী বহুদিনই একবেলা খাওয়া ত্যাগ করেছে—আর একবেলাও বোধ হয় পেট ভরে খেতে পায় না বেচারী। একখানি তার শাড়ী, সাবান দিয়ে কেচে কেচে পরে, শাড়ী যখন ভিজে থাকে গামছা পরে শুকোতে হয়। তা-ও সয়েছিল, কিন্তু আজ আর ঘরে কিছু নেই। তাদের তো নেই-ই—রোগা ছেলেমেয়েদুটির পথ্যি বলতেও কিছু নেই। পাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বিনামূল্যে ওষুধ দেন, কিন্তু পথ্যি কোথায় পাওয়া যাবে ? ছেলেটাকে গ্লুকোজ না খাওয়ালে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না, মেয়েটার জন্য চাই বার্লি। ওদের বাড়ীর উপরতলায় একঘর ভাড়াটে ছিল, তাদের একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে কলেজে পড়ত—সে এই রকম সময়ে অনেকবার নিজের টিউশনির টাকা থেকে মিশ্রী, বার্লি এনে দিয়েছে—কিন্তু ভগবানের তা-ও সইল না—সে ছেলেটি গত নবেম্বর মাসে রাস্তায় গুলি খেয়ে মারা গেল !

সত্যিই আজ আর কোন উপায় ছিল না। জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ

হয়ে গেছে সুরেন। যা কিছু সৎ, যা কিছু ন্যায়, তার প্রসঙ্গ-মাত্রই আজ উপহাসের বস্তু ওর কাছে। ওর মনিবরা মাইনে হিসেবে অনেক টাকা নিয়ে—বহু খরচা দেখিয়েও এ বছরে নাকি ঘরোয়া অডিটে দেখা গেছে, প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করেছেন। এই লাভটাকে কী ক'রে কম দেখানো যায় তারই মন্ত্রণা চলেছে আজ ক'দিন ধরে বাপ-বেটায়—এ নিজে কানে শুনেছে সুরেন। অথচ ওদের দোকানে চাকর নিয়ে মোট উনিশজন কর্মচারী, একমাসের মাইনে বোনাস্ দিলেও পাঁচশ' টাকার বেশী খরচ হ'ত না। একথা সে তাঁদের বলে নি অবশ্য —বলতে ঘৃণা বোধ হয়েছে—কিন্তু বললেও ফল হ'ত না, তা সে জানে। সুতরাং ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তো, তিনি নিশ্চয় বলবেন যে আজ যখন ওর রোগা ছেলে-মেয়ের পথ্যের সংস্থান নেই, একটু গ্লুকোজের অভাবে ওর প্রথম সন্তান মরতে চলেছে, স্ত্রী তিনদিন অনাহারে, তখন এইভাবে বই বেচে টাকা নেওয়াতে আর যাই হোক—চুরির অপরাধ ওকে স্পর্শ করে নি। বিশ্বাসঘাতকতা ? তাও তিনিই ক্ষমা করবেন, মনের কাছে অস্বীকার করবে না ও—কিন্তু লজ্জিতও হবে না।

এক রকম জোর ক'রেই উঠে পড়ল সুরেন। রাত অনেক হয়েছে—ন'টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ! খোকন তার শীর্ণ শরীরের সবটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ ক'রে কাঁদছে হয়ত—খুকীটা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে ; সরমা হয়তো তাদের রোগশয্যার পাশে চুপ ক'রে বসে আছে, নয়ত কপাটটা ধরে তারই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতটা রাত করা ওর উচিত নয় নি—একটু অন্যায়ই হয়েছে বরং।

কিন্তু, চল্‌তে চল্‌তে ওর বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী অন্তর এই কথাটাই বার বার বলতে লাগল—আর পারে না ও, আর পারছে না ! এতদিন কি-ক'রে পেরেছে তাই ভাবতেই অবাক লাগে। হয়ত একটা অভ্যাসে,

কিছু না ভেবেই ভারবাহী বলদের মত সবকিছু সহ্য ক'রে এসেছে। কিন্তু এইবার মনে হচ্ছে, আর কেন? এমন ক'রে বেঁচে থেকে লাভ কি? ছেলেমেয়েদের কি হবে? মরে গেলে আর সে খবর নেবার দরকার হবে না।

ভাবতে ভাবতে ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কী হয়—একটা মোটা রকম ইন্‌সিওর ক'রে যদি আত্মহত্যা করে? সেও বুঝি আবার তেরো মাস না গেলে মঞ্জুর নয়। আচ্ছা, আত্মহত্যা বলে যদি আত্মহত্যা না করে—সে-ই বা কেমন হয়? হঠাৎ একটা মোটর গাড়ীর সামনে পড়ে যাওয়া—সবাই জানবে দুর্ঘটনা? কিংবা অত কাণ্ড করারই বা দরকার কি! প্রায় রোজই, একটু মোটা টাকা থাকলেই কর্তা তাকে ব্যাঙ্কে জমা দিতে পাঠান। সেই টাকাটা বাড়িতে স্ত্রীর হাতে দিয়ে এসে যদি আত্মহত্যা করে? অবশ্য হাজার কি দেড় হাজার টাকায় তাদের বেশীদিন চলবে না সত্য কথা, কিন্তু সুরেন মারা গেছে জানলে ওর দাদা বা ছোট ভাই হয়তো কিছু কিছু সাহায্য করতে পারে, নইলে অনাথাদের রাস্তার লোকও অন্তত দেখবে। সে আছে বলেই তো তারা ভিক্ষা করতে পারে না। আর তা ছাড়া, সে যা হয় হবে। অত ভাবতে পারে না সে, আর এই কষ্ট সে কিছুতে সহ্য করবে না। এ জীবনের—এ বেঁচে থাকার মূল্য কি?

যতই ভাবে ততই এই কথাটা বার বার মনে হয় ওর—জীবনে ওর আর কোন সুখ, কোন স্বাচ্ছন্দ্যের আশা নেই। ছেলেরা কবে বড় হয়ে উঠবে তার ঠিক নেই—বড় হ'লেও মানুষ হয়তো হবে না, কে করবে? সুতরাং সে ভরসা নেই। মিছি-মিছি এই আশাহীন, আনন্দহীন, বর্ণহীন জীবন সে আর ক'দিন বইবে, লাভ কি? ম'লে কি হবে তা সে ভাবে না; নরক যদি বা থাকে, সেখানে প্রতিদিনের অন্নসংস্থানের এমন বিড়ম্বনা তো সহ্য করতে হবে না। এ বেঁচে-থাকার চেয়ে আত্মহত্যার পাপে নরকে যাওয়াও ভাল—

চোখ জ্বলতে থাকে সুরেনের, উত্তেজনায় বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে। ঠিক হয়েছে, আর না! অব্যাহতির পথ, মুক্তির পথ সে পেয়েছে। আর একটা কি দুটো দিন! এর মধ্যেই সে ঠিক ক'রে ফেলবে। এ তিক্ততা থেকে, এ নিরবচ্ছিন্ন নিরানন্দ থেকে মুক্তি পাবে ও!

ঘরের দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেই কিন্তু সুরেন চম্‌কে ওঠে। অনেক—অনেক দিন পরে, বোধ হয় এক যুগ পরে, উজ্জ্বল মুখে দাঁড়িয়ে আছে সরমা। পরনে ওর একটা ধোওয়া নতুন শাড়ী, পায়ে আলতা, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। বড় সুন্দর মানিয়েছে ওকে কিন্তু, মনে হচ্ছে যেন দশ বছর আগে ফিরে গেছে সে—বয়সও এত কম দেখাচ্ছে!

কিন্তু ব্যাপার কি?

কিছুই বুঝতে পারে না সুরেন। হতভম্বের মত, অভিভূতের মত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। সারাদিন একটা একটানা মানসিক অন্ধকারের মধ্যে সে ছিল, তারপর হঠাৎ এই ঔজ্জ্বল্যের আবহাওয়াতে এসে যেন তার চোখও ধাঁধিয়ে গেছে। ভাল ক'রে দেখতেও পাচ্ছে না—

সরমা ওর দৃষ্টির দিকে চেয়ে একটু লজ্জিত হ'ল। কাছে এগিয়ে এসে বললে, 'ওপরের মিত্তির-গিন্নির বৌ আজ একাদশীর ব্রত নিলে। আমাকে দিয়েই নিলে কিনা—এই নতুন কাপড়খানা, আল্‌তা-সিঁদুর সব দিয়েছে। এধারেও আজ শুভ খবর আছে বলে মনটাও ভাল ছিল—তাই সব আবার এবেলা পরলুম, তোমাকে চমক্ লাগিয়ে দেবো বলে—'

আস্তে আস্তে সুরেন প্রশ্ন করলে, 'এধারের শুভ খবরটা কি?'

'খোকার জ্বর আজ একদম রেমিশন হয়ে গেছে।'

'একেবারে ছেড়ে গেছে ?' শুনেও বিশ্বাস হ'তে চায় না ওর।

'একেবারে।'

'আর খুকী ?'

'খুকী বার-তিনেক পায়খানা গেছে বটে—তবে রক্তটা আর নেই।'

সুরেনের হাত থেকে জিনিসগুলো নামিয়ে নিতে নিতে সরমা বললে, 'এই যে তুমিও গ্লুকোজ পেয়েছ। আজ ঠাকুরপো এসেছিলেন কার মুখে যেন খবর পেয়ে—এই একটু আগে। তিনিও একটা প্যাকেট দিয়ে গেছেন।'

'মোহিত এসেছিল ? বল কি !'

'হ্যাঁ—কি ভাগ্যি ! অফিসে যেন কার মুখে খবর পেয়েছিল খোকার অসুখের।' তারপরই সুরেনের মুখের অপরিসীম শুষ্কতার দিকে নজর পড়তে বলে উঠল সরমা, 'ইস্, তোমার মুখখানা কী হয়ে গেছে গো—যেন একবোতল কালি ঢেলে দিয়েছে কে। ব'সো ব'সো—জামা পরে ছেড়ো, একটু জল খাও আগে—'

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। একটা ভিজে গামছা ক'রে ওর মুখটা মুছিয়ে দিয়ে সরমা কোথা থেকে একটা সন্দেশ এনে ওর মুখের কাছে ধরল।

'এ আবার কি ?'

'হ্যাঁ মশাই ! দস্তুরমত আমার রোজগার আজ। ওরা দিয়েছিল—ব্রতর মিষ্টি। চারটে সন্দেশ ছিল, একটা বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছি তোমার জন্যে—আবার দু'আনা পয়সাও পেয়েছি, দক্ষিণা !'

সুরেনের তখনও স্তম্ভিত ভাব কাটে নি, সে তেমনি অভিভূতের মতই বসে একটু একটু ক'রে সন্দেশটা খেতে লাগল। তবে কি এখনও কিছু মাধুর্য আছে জীবনে ? কিছু আলো ?

সহসা ওর পাশে বসে পড়ে সরমা নিবিড়ভাবে ওর হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'কী অত ভাবছ গো ? সবাই তো ভাল আছে, তবে অত ভাবনা কেন ?'

স্নরেন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'তোমাকে বেশ মানিয়েছে—তাই ভাবছি!'

'কখনও তা ভাবছ না—সত্যি ক'রে বলো দেখি?'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে স্নরেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'এখানে আসবার আগে কী ভাবছিলুম জানো সরমা? ভাবছিলুম আমি আত্মহত্যা করব। আর সইতে পারছিলুম না।'

সরমা শিউরে উঠল যেন। তারপর রাগ ক'রে ওর হাঁটুটা ঠেলে দিয়ে গাঢ়কণ্ঠে বললে, 'পুরুষমানুষ এমনি স্বার্থপর বটে! আমার কষ্ট কিছু কম হচ্ছে, না? আমারও অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে যে, ম'রে সব জ্বালা জুড়োই, কিন্তু পারি নি তোমার জন্যেই। মনে হয়েছে যে, অফিস ক'রে আবার ছেলে-মেয়েদের সাম্‌লাবে কি ক'রে তুমি—একা মানুষ, বড় কষ্ট হবে। অবস্থাও ভাল নয় যে, আর একটা বিয়ে করবে। সত্যি বলছি—এই মনে ক'রেই আমার মরা হয় নি কখনও।'

স্নরেন জোর ক'রে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'অন্যায় হয়েছিল—এবারে মাপ করো, আর কখনও এমন ভাবব না।'

সরকারী অফিসের মোটা মাহিনার প্রায়-সাহেবী পদে যাঁহারা ইতিপূর্বে অনুকূলবাবুকে দেখিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে মোটা মালা ও টিকি, খাটো বহির্বাস এবং অসংখ্য-তিলক-শোভিত চৈতন্যদাস বাবাজীর মধ্যে তাঁহাকে চিনিয়া বাহির করা একটু কঠিন বৈ কি!

তবু সংসারে এম্‌নিই হয়। বারবারই হয়। সেইদিনকার সেই উগ্র সাহেবী মেজাজওয়ালা অখাদ্যলোলুপ ডেপুটি কণ্ট্রোলারের পক্ষেই বরং হয়ত চৈতন্যদাস বাবাজী হওয়াটা স্বাভাবিক। বা সেই জীবনেরই এটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

চৈতন্যদাস সংসার হইতে বহুদিন অবসর লইয়াছেন। ষাট বৎসর বয়সে অফিস হইতে রিটায়ার করেন তিনি, অবশ্য তাহার মধ্যেই তাঁহার গুরু-কৃপা-লাভ হইয়াছিল, যদিচ ভেখ দেওয়ার অবস্থা তখনও হয় নাই। কলারের নিচে কণ্ঠি থাকিলেও অফিস যাওয়ার সময় নাসিকার তিলক মুছিয়া যাইতে হইত। অফিস ত্যাগ করার পর এসব আত্মপ্রবঞ্চনার প্রয়োজন না থাকিলেও সংসারে থাকিয়া সাধন-ভজনের সুবিধা হইল না। বাধা বিস্তর। অফিস হইতে রেহাই পাইবার তবু একটা বয়স আছে কিন্তু সংসার হইতে রেহাই পাইবার বয়স নাই। একেবারে অশক্ত হইলে ত্যাগ করে, উপেক্ষা করে, কিন্তু তাহার পূর্বে কোন অজুহাতই গ্রাহ্য করে না! বিষয় তো পুরুভুজের মত আট দিক দিয়া বেষ্টন করিয়া আছেই, আত্মীয়তার বন্ধনও কম নয়। ছেলেমেয়েদের সংসার, নাতি-নাতিনী, তাহাদের শিক্ষা-চাকরী-বিবাহ—এমনি সহস্র ঝঞ্ঝাট ও দায়। সকলেই আশা করে যে, তিনি তাহাদের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অসুখ-বিসুখে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা তো আছেই। এ-ছাড়া অনাত্মীয়দের হাত হইতেই কি অব্যাহতি আছে? তাহারা বিশ্বাসই করে না যে,

তাঁহার একটাও চাকরী করিয়া দিবার সুবিধা নাই। আবার যাহাদের চাকরী আছে তাহাদের উন্নতির সুপারিশ চাই। এমন কি হাসপাতালে 'বেড্' পাইবার প্রয়োজন থাকিলেও তাঁহার চিঠির তাগিদ আসে। পাড়ার কমিটি আছে, তাহাদের চাঁদা আছে—দলাদলি, ভোট, পল্লী-রাজনীতি, কি নাই!

অথচ এসব আর কি ভাল লাগে?

এ বয়সে তো করিয়াছেনও ঢের, চিরজীবনই তো এই লইয়া কাটিল, আর কেন? গুরুকৃপা যাঁহার লাভ হইয়াছে, ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ধানে যিনি পা বাড়াইয়াছেন, তাঁহার আর এইসব তুচ্ছ পার্থিব ব্যাপারে জড়িত থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, কাহার জন্যই বা? আত্মীয়তা কিম্বা বন্ধুত্ব কোনটাই তাঁহার মুখ চাহিয়া কেহ বজায় রাখিতে চায় না, সবাই চায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে। সংসারের প্রত্যেকটি লোকই আত্মকেন্দ্রিক, সকলেই নিজের চারপাশে ঘুরিতেছে। তবে তিনিই বা কল্পবৃক্ষের মত পরের প্রয়োজন সাধিতে এই শুষ্ক নীরস সংসারমরুতে দাঁড়াইয়া থাকিবেন কেন?

সুতরাং—একদিন তিনি 'দুত্তোর' বলিয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।

সেটা বোধ হয় রিটায়ার করার বছর দুই পরে। অবশ্য সে-ও প্রায় আট বছরের কথা, এখন তাঁহার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। আট বছর পূর্বে সেই যে সংসার ছাড়িয়া মাত্র একটি ট্রাঙ্ক, একটি স্যুটকেস, একটি হোল্ড-অল ও একটি চাকর লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, আর কোনমতেই গৃহে ফিরিয়া যান নাই। তারপর ত্যাগ করিয়াছেন বিস্তর; ধুতি ছাড়িয়া বহির্বাস ধরিয়াছেন, জামা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন,—এমন কি স্বাদু আহার্যও। সকাল বেলা চা আর খান না, তাহার পরিবর্তে ঘোল; দুপুরে দুই মুঠা প্রসাদ এবং রাত্রে একটু দুধ, এই আজ তাঁহার সম্বল। শুধু শয্যাটাই এখনও ছাড়িতে পারেন নাই, ভাল নরম বিছানার উপর একটি কন্থা বিছাইয়া বৈরাগ্যের নিয়ম রক্ষা করেন।

ইতিমধ্যে বারবারই সংসার হইতে ডাক আসিয়াছে। বড় নাতনীটি মারা গেল, সেজ নাতনীর বিবাহ, তাছাড়া পৌত্রদের উপনয়ন, বিবাহ এবং প্রপৌত্রদের অন্নপ্রাশন—এসব তো ছোটখাটো ব্যাপার লাগিয়াই আছে। কিন্তু তবু তখনও তাঁহার চরম পরীক্ষা ভগবান লন নাই। সেটা শুরু হইয়াছে মাত্র ত্থ'বছর আগে, যখন তাঁহার বড় ছেলেটি নিউমোনিয়ায় মারা যায়। তাহার পর দ্রুতবেগে আসিতে লাগিল আঘাতের পর আঘাত ; মেজ ছেলেটি বসন্তে এবং বড় মেয়েটি গ্রহণীতে মারা গেল।

আঘাত গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই, সংসারকে যতই বর্জন করুন এসব ব্যাপারে ব্যথা এখনও খুবই বাজে—এমন কি ঈশ্বর-চিন্তাতেও যেন মধ্যে মধ্যে ব্যাঘাত জন্মায়। তবু এখান হইতে নড়াইতে পারে নাই কেহ তাঁহাকে। চিঠি, টেলিগ্রাম—অনুরোধ-উপরোধ, কান্নাকাটি, এমন কি সেখান হইতে লোকও আসিয়াছে, কিন্তু তিনি আর বাড়ি ফিরিতে রাজী হন নাই। যে যাইবার সে যাইবেই, পরমায়ু ফুরাইলে কেহ ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। শুধু শুধু তিনি গিয়া কি করিবেন। চোখের দেখা ? এতকাল তো দেখিয়াছেন, এখন আর একবার সেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগবিকৃত মুখ না দেখিলে নয় ? তিনি মরিয়া গেলে তাহারা কি করিত ? আর তিনি তো মরারই সামিল, সংসারের কাছে সম্পূর্ণ মৃত। তাঁহার আর পাওনাও নাই, দেনাও নাই। শুধু তাহারা এখন অব্যাহতি দিক তাঁহাকে, এইটুকু শুধু চান। সেখানের সমস্ত আব্‌হাওয়াতে আছে সাংসারিক চিন্তা, বিষয়ের চিন্তা, সেখানে গেলে সাধনভজন বহু দূরে সরিয়া যায়—সেখানে আর তিনি যাইতে রাজী নহেন।

তাঁহার এই সংযমে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার খুব নিষ্ঠাবান গুরুভ্রাতারা পর্যন্ত। তিনি তাহাদের হাসিয়া জবাব দিয়াছেন, 'বাপু হে, ঘুঁটি কাঁচা থাকলেই দাবা খেলাতে মারা যাবার সম্ভাবনা। আমরা যে পাকা ঘুঁটি, আমাদের মারে কে ? মায়ার

টান্ খুবই জোর সন্দেহ নেই—কিন্তু ঠিক ভগবানের খুঁটিতে বিশ্বাসের শেকল দিয়ে যদি মনের নৌকোখানা বাঁধতে পারো, তাহ'লে কোন টানই তাকে নিয়ে যেতে পারবে না! আসল কথা ঘুঁটিটা পাকা হওয়া চাই, নিজেদের ভাল ক'রে পাকাও আগে!'

একথা শুনিবার পর সম্ভ্রমের সহিত চাহিয়া থাকা ছাড়া আর উপায় কি?

কিন্তু অকস্মাৎ আর একটি আঘাত আসিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে।

ছোট ছেলে চিঠি লিখিয়াছে—

'দিদি মরবার পর থেকেই মার শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল—কোনমতে বেঁচে ছিলেন—এইমাত্র, কিন্তু এবারে আর বোধ হয় তাও থাকবেন না। মনে হচ্ছে এবার তাঁর পালা। অভিমানে এতদিন কিছুই বলেন নি, কিন্তু সম্প্রতি আপনার বধূমাতাদের কাছে জানিয়েছেন—শেষবারের মত একবার স্বামীর দেখা পাবার জন্যই প্রাণটা তাঁর বেরোচ্ছে না, এত কষ্টেও ধুক্ ধুক্ করছে। আপনার বৈরাগ্য এবং সাধনার কথা স্মরণ ক'রে একথাটা আপনাকে লেখার আর ইচ্ছা ছিল না, শুধু কর্তব্যবোধেই জানাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের কোন দায়িত্ব না থাকে। তাঁকে আর এখন বৃন্দাবনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, বিছানাতে তুলে বসাতেই ভয় করে—যে-কোন মুহূর্তে হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হ'তে পারে। সুতরাং তাঁর ইহজীবনের শেষ বাসনা মেটাবার একমাত্র উপায় আছে আপনার অন্তত একটিদিনের জন্য এখানে আসা। এতকালের সাধন-ভজন এবং বৈরাগ্য যদি একদিন সংসারের মধ্যে এসে দাঁড়ালে নষ্ট হয়ে যায় তো স্বতন্ত্র কথা—নইলে একবার আস্‌তে দোষ কি? আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। ইতি—'

চিঠিখানা পাইয়া প্রথমটা তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। ইহারা কি তাঁহার নির্জনবাসের বিঘ্ন ঘটাইবার জন্যই এমন পরামর্শ করিয়া মরিতে শুরু করিল? আর তাঁহাকে লইয়া এমন টানাটানি করিবার অর্থই বা কি? তিনি যাহাদের চিরকালের মত ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কোন সম্পর্কই আর রাখেন না, তাহাদের এমন নির্লজ্জভাবে সেই ছিন্ন সম্পর্ককে আঁকড়াইয়া থাকারও কোন অর্থ তিনি বোঝেন না।

আর তেমনি অকালপক্ক হইয়াছে এই ছোট ছেলেটি তাঁহার! চিঠি লিখিবার ভাষা দেখ না! এই ছেলেটির দিকে তিনি কখনই মনোযোগ দিতে পারেন নাই, কারণ ইহার পাঁচছয় বৎসর বয়সের সময় হইতেই তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছেন—উহাকে মানুষ করিয়াছে উহার মা ও দাদারা। মানুষ তো হয় নাই, মা ও দাদাদের অত্যধিক আদরে একটি বানর তৈরী হইয়াছে!

আবার লিখিয়াছে, 'আপনার এতদিনের সাধন-ভজন এবং বৈরাগ্য যদি একদিন সংসারে এলে নষ্ট হয়ে যায় তো স্বতন্ত্র কথা'—আরে মূর্খ, এ কি লোক-দেখানো বৈরাগ্য আর অন্তঃসারশূন্য সাধনা যে, একদিনে নষ্ট হইয়া যাইবে? অহঙ্কার করা অবশ্যই উচিত নয়, তবু একথাটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এতকালের কৃচ্ছ্র্সাধনা ও ঐকান্তিকতায় আজ তিনি এমন স্তরেই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, কোন প্রলোভনে এবং কোন ব্যাঘাতেই তাঁহার সে তপস্যায় বিঘ্ন ঘটা সম্ভব নয়। তাঁহার যা মনের কথা, তাহা ঐসব অর্বাচীন বালক আর ঘোর সংসারী জীবরা বুঝিবে কি করিয়া? আসলে আর-যে কোন টান্ই বোধ করেন না তিনি তাহাদের জন্য। মনকে যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এবং নিস্পৃহ করিয়া ফেলিয়াছেন—সে যে আর তাহাদের সম্বন্ধে এতটুকুও উৎসুক কিংবা কৌতূহলী নয়। তিনি যে কোন পার্থিব সম্পর্ককেই স্বীকার করেন না—বাহিরেও না, অন্তরেও না। কে তাহারা? পৃথিবীতে তো বহু লোক, লক্ষ লক্ষ লোক প্রত্যহ রোগে ভুগিতেছে এবং মারা যাইতেছে, তার জন্য তিনি করিবেন কি?

দেহ ধারণ করিলেই রোগ-শোক-জরার অধীন হইতে হয়। আর-পাঁচজনের মৃত্যুতে উহারা বিচলিত হয় কি ? তবে তিনিই বা উহাদের মৃত্যুতে বিচলিত হইবেন কেন ? তাঁহার কাছে পৃথিবীর আর-পাঁচজন মানুষের সঙ্গে উহাদের পার্থক্য কি ? আজ যে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-আত্মীয় সবই শ্রীগোবিন্দ। ঐ এক আত্মীয়তাতেই তিনি মশগুল হইয়া আছেন আর কোন আত্মীয়ের কথা আজ মনেও পড়ে না···

তাচ্ছিল্যভরে চিঠিখানা একপাশে গুঁজিয়া রাখিয়া চৈতন্যদাস আবার জপে মনোযোগ দিলেন। তিনি নিয়ম করিয়া প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করেন সুতরাং ভোর হইতে গভীর রাত পর্যন্ত তাঁহাকে জপ করিতে হয়। আজকাল বহুক্ষণ ধরিয়া জপ করিতে করিতে যখন এক এক সময় নামরসে বিভোর হইয়া পড়েন তখন মানস চোখে দেখিতে পান যেন অপূর্বসুন্দর একটি রাখাল বালক তাঁহার সামনে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে ! তবে একটা অসুবিধা এই যে, বালকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে গেলেই তাহার মুখে জ্যেষ্ঠ দৌহিত্রটির মুখের কেমন একটা সাদৃশ্য আসিয়া পড়ে—প্রাণপণ চেষ্টাতেও সে ধারণাটাকে দূর করিতে পারেন না।

আজও জপে মনকে ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করেন।

সত্য-সত্যই—ঈশ্বরেরও করুণা আছে তাঁহার উপর, এটা মানিতে হইবে। নহিলে এই দীর্ঘ আট বৎসর তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়াছেন —এই সময়ের মধ্যে একবারও আর দেখিবার ইচ্ছা হয় নাই কেন ?

তাহারা তো তাঁরই আত্মজ—আত্মার সহিতও জড়িত বটে। নিজেরই রক্তমাংসের সৃষ্টি তাহারা ! আর রক্তমাংসের যে নয়, সে তো বরং আরও আপন। বিবাহ করিয়াছেন তিনি যখন, তখন তাঁহার মাত্র একুশ বছর বয়স—স্ত্রী জাহ্নবীর বয়স তেরো—তার পর এই দীর্ঘকাল—চল্লিশ বছরেরও বেশী—তাঁহারা একসঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাটাইয়াছেন—দু-চার দিন বিদেশে যাওয়া ছাড়া আর কোন কারণেই তাঁহাদের বিচ্ছেদ ঘটে নাই কখনও। সেই স্ত্রীকেও তো ছাড়িয়া

আসিয়া অনায়াসে এতদিন আছেন, আশ্চর্য! বিশেষত, স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ টান থাকিবার যখন যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

না, এটা স্বীকার করিতেই হইবে—স্ত্রীভাগ্য তাঁহার খুবই ভাল ছিল। জাহ্নবী স্বামীকে একটি দিনের জন্যও দুঃখ দেন নাই। সমস্ত সংসারটা তিনি চিরকাল হাল ধরিয়া থাকিয়া চালাইয়াছেন, কখনও স্বামীকে সেজন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিব্রত করেন নাই। সংসারের ছোটখাটো তথ্য লইয়া তিনি কখনও মাথা ঘামাইয়াছেন এমন কথা মনেই পড়ে না। তা ছাড়া, আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী—এ ধরনের দুশ্চিন্তা হইতেও জাহ্নবী চিরকাল তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছিলেন! সাংসারিক যন্ত্রটি নির্বিঘ্নে ও নিঃশব্দে ঘুরিয়া গিয়াছে বলিয়াই আজ ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এতটা উদাসীন থাকিতে পারিয়াছেন। পেন্সনের অর্ধেক টাকা তিনি এখানে খরচ করেন—সে তো ঐ ভরসাতেই যে, সেখানে কোন অভাব-অভিযোগ নাই। তাঁহার চেয়ে অনেক বেশী মাহিনার অফিসারকেও তিনি পেন্সনের পর নিঃস্ব অবস্থায় মার্চেন্ট অফিসে চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিতে দেখিয়াছেন—অথচ তিনি তো সংসার চালাইয়া, ইন্‌সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিয়াও একটি বসতবাড়ি এবং ভাড়াটে বাড়ি করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কন্যার বিবাহও দিতে হইয়াছে। আজ অবশ্য ছেলেরা সকলে রোজগার করে—কিন্তু সেদিন?

গোবিন্দ! গোবিন্দ!

এসব কী চিন্তা করিতেছেন তিনি? জপে বসিয়া এ কী কাণ্ড! একেই বলে মায়া—বিচিত্র মায়া বটে!

তিনি আবার জপে মন দিলেন। পাশে গোঁজা চিঠির কাগজের প্রান্তটা ঈষৎ কাঁপিতেছে। সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল জাহ্নবীও তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন। এখানে আসিবার সময়

তিনি স্ত্রীকেও সঙ্গে আনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নয়—এমনি পরিচিত দুই স্ত্রীপুরুষ তো কাছাকাছি থাকিয়া সাধন-ভজন করিতে পারে। তাহাতে বাধা কি ? জাহ্নবীও চলুন না ! জাহ্নবী উত্তর দিয়াছিলেন, 'এখান থেকে হাজার মাইল দূরে গেলেই কি আর মায়ার বন্ধন এড়াতে পারব ? এ বড় কঠিন মায়া, বুঝলে ! এ থেকে অব্যাহতি পাওয়া অত সোজা নয়। গিয়ে শুধু মুখে জপ করলেই তো আর হ'ল না ! মন পড়ে থাকবে এখানেই। সে বড় অপরাধ। তার চেয়ে তুমিই যাও, পারো তো !'

জাহ্নবী চিরদিনই ঐ রকম। স্পষ্টবাদিনী ও সত্যদর্শিনী। কোন ভুয়া মোহ তাঁহার নাই—যা সত্য তা স্পষ্ট দেখিতে পান চোখে এবং স্বীকার করিতে ভয় পান না।

এই তাঁহার স্বভাব—আশৈশব। যখন ত্রয়োদশী কিশোরী ছিলেন—ঈষৎ-উদ্ভিন্ন ফুলের কুঁড়ির মত, যখন স্বামীর উত্তপ্ত চুম্বন এবং অর্থহীন প্রেমের প্রলাপে তিনি বিহ্বল হইয়া শুধু চাহিয়াই থাকিতেন—তখনও সত্য-নিষ্ঠা ছিল তাঁহার অসাধারণ। নিজের মনকে তিনি ভাল করিয়াই চিনিতেন, কখনও আত্মপ্রবঞ্চনার চেষ্টা করেন নাই।

ও, এখনও তাঁহার সে-সব দিনের কথা মনে আছে—আশ্চর্য !

সেই বহুযুগ আগেকার, আবেগ-থরোথরো প্রেমবিহ্বল দিনগুলি !

জাহ্নবী তখন সত্যই সুন্দরী ছিল। পুরুষের কামনার ধন হইবার মতই ছিল তাহার রূপ। মসৃণ পেলব চর্ম, গৌর বর্ণ, চম্পককলির মত আঙুল, এবং দীর্ঘ আয়ত নেত্র ! সেকালের বৈষ্ণব কবিরা যে এত বয়স থাকিতে রাধারাণীর কিশোরী রূপই কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ আছে—

রাধে, রাধে !

এ কী পাপ ! এ কী সব চিন্তা আজ মনে আসিতেছে। কোন বয়সে, কোন তপস্যাতেই কি এই চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা নাই ?

চৈতন্যদাস বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এখন আর মনকে জপে নিবিষ্ট করা চলিবে না। মন আজ বড়ই বিক্ষিপ্ত। আবার একটু ঘুরিয়া আসিলে হয়ত—

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সন্তানের মৃত্যুসংবাদেও তিনি এতটা বিচলিত হন নাই। সাময়িক আঘাত হয়ত পাইয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বর-চিন্তায় কিম্বা নামজপে বসার সঙ্গে সঙ্গে মন শান্ত হইয়া গিয়াছে।

স্ত্রী কি তাহা হইলে সন্তানের চেয়েও বেশী?

তা এক রকম বৈ কি! ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটু একটু করিয়া আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে, ফলে তাহাদের সম্বন্ধে একটা বিতৃষ্ণা বা বিদ্বেষেরও সৃষ্টি হয় পুরুষের মনে—কিন্তু স্ত্রীর প্রতি সে রকম কোন মনোভাব গড়িয়া উঠিবার কারণই ঘটে না। বয়স ও সংসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সহিত ঘনিষ্ঠতা কমে সত্য, তবে আন্তরিক সম্পর্কটা তো এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় না! সমস্ত কাজ এবং সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও তাঁহার প্রতিদিনের প্রয়োজন বা অভ্যাসের কথা জাহ্নবী কখনও বিস্মৃত হইতেন না। একটা চোখ এবং একটা কান যেন সর্বদা তাঁহার স্বামীর দিকে অতন্দ্র হইয়া থাকিত।

সেইজন্য স্ত্রী যে কখন ধীরে ধীরে নিজের আত্মার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে, জীবনের সমস্ত কিছুর সহিত সে বাঁধা পড়িয়াছে—তাহাও তিনি কখনও অনুভব করেন নাই। শুধু এটা এই শ্রীধামে আসিবার পর নিজের মনের কাছে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রথম বৈরাগ্য ও সংসার-বিতৃষ্ণার উগ্রতার মধ্যেও যাহার অভাবটা তিনি বারবার অনুভব করিয়াছেন সে তাঁহার পুত্রকন্যাদের কেহ নয়—তাহাদের জননী।

স্ত্রীর কাছে ঋণ তাঁহার আছে বৈ কি।

অনেক ঋণ আছে, এবং দেহ যখন ধারণ করিতে হইয়াছে, দেহীর সমস্ত দায় বহন করিতে হইতেছে, তখন সে ঋণই বা অস্বীকার করেন কি করিয়া? লোকে যে অকৃতজ্ঞ বলিবে!

সামান্ত চোখের দেখার জন্য তাহার প্রাণটা বাহির হইতেছে না—এটুকু হইতে বঞ্চিত করিবারই বা কী অধিকার আছে তাঁহার ? এতই কি বৈরাগ্যের দম্ভ ?

আচ্ছা, তিনি তো এখনও বেশ বাঁচিয়া আছেন—জাহ্নবীর এরই মধ্যে মরিবার কী বয়স হইল ? হয়ত সন্তানদের শোকেই বেচারী শয্যা লইয়াছে—তিনি কাছে থাকিলে, সান্ত্বনা দিবার একটা লোক থাকিলে, এমন করিয়া কাতর হইয়া পড়িত না। বেচারী !

স্ত্রীর জন্য তাঁহার একটা দীর্ঘনিশ্বাসও বাহির হইল।

কতদিন দেখেন নাই জাহ্নবীকে। বহু বৎসর। এতদিনে কেমন দেখিতে হইয়াছে কে জানে। হয়ত খুবই খারাপ হইয়া গিয়াছে চেহারাটা, অমন সোনার মত রং—তাও হয়ত আর নাই। আর বয়সও তো কম হইল না। এখন তাঁহাকে দেখিলেও জাহ্নবী চিনিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। চৈতন্যদাস একবার মন্দিরের আয়নাটার সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। না, এমন কিছু পরিবর্তন হয় নাই। জাহ্নবীই বরং হয়ত অনেক বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। কেমন দেখিতে হইয়াছে কে জানে।

আর একবার স্নান করিয়া আসিয়া চৈতন্যদাস জপে বসিলেন, কিন্তু তবু মন লাগে না। সে কিশোর বালক আজ একবারও মানস-চোখে ধরা দেয় না। তাহার বদলে বার বার মনে জাগে একটি নারীমূর্তি—কখনও কিশোরী, কখনও তরুণী, কখনও যুবতী। সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় যে রমণী দীর্ঘকাল ছায়ার মত পাশে থাকিয়া নিজের সমস্ত সত্তা বিসর্জন দিয়া স্বামীর আত্মার সহিত নিজেকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সে আজ এতকাল পরে সমস্ত বৈরাগ্য-সমুদ্র সাঁতার দিয়া বহুদূর হইতে নিজের প্রাপ্য আদায় করিতে আসিয়াছে। আজ তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ নয়।

সমস্ত দিন গেল—সমস্ত রাত্রি। অবশেষে ভোরের দিকে স্থির করিলেন তিনি ফিরিবেন—অন্তত একদিনের জন্য।

দুপুরে তুফান ছাড়ে হাতরাস হইতে, যাইতে হইলে এখনই যাত্রা করিতে হয়। তিনি তখনই নিজের চাকরকে ডাকিয়া তুলিলেন। হাঁক-ডাক, বিছানা-পত্র বাঁধা শুরু হইয়া গেল। ন'টার মধ্যে যাত্রা না করিলে ঠিক সময়ে পৌঁছানো যাইবে না।

শুধু যেন স্থির করার অপেক্ষা ছিল এতক্ষণ। তাহার পর ভিড় করিয়া কত কথাই মনে আসিতে লাগিল।

জাহ্নবী পেঁড়া খাইতে ভালবাসিত। হয়ত খাইবার অবস্থা নাই—তবু লইতে দোষ কি? ভাল লিচু উঠিয়াছে এখন। কমলালেবু কিছু লওয়া দরকার। পথে যদি মোগলসরাইতে কাশীর ল্যাংড়া কিছু পাওয়া যায়। গোবিন্দের প্রসাদ একটু—চরণতুলসী ঐ সঙ্গে। তাঁহার নিজের জন্য এক গুরুভাই একটি গ্লুকোজ দিয়া গিয়াছিলেন—সেটাও সঙ্গে লইবেন, কে জানে কী পথ্য ব্যবস্থা করিয়াছে ডাক্তাররা, হয়ত ওসব আজকাল পাওয়াই যায় না।

সারা সকালটা চৈতন্যদাস ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলেন।

এখানে এসে অসীমের খুশির সীমা নেই। এ তার স্বপ্নেরও অতীত, এ বিলাসের কল্পনা পর্যন্ত করতে সে কখনও সাহস করে নি। সে অবাক হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে, বিস্ময়ে তার চোখ ছুটো বড় বড় হয়ে ওঠে নির্জনেই। প্রতিটি রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে প্রশ্ন করে, এখানে কি সত্যিই একটা দিন একটা রাত তার কেটেছে?

আর খাওয়া?

বড়লোকেরা স্বতন্ত্র জীব, তারা খুব ভাল খায়, এইরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে ছিল মাত্র—কিন্তু সাধারণ মানুষ, বিশেষ ক'রে তার মত মানুষ যে এমন খেতে পায় বা খায়, তা কে জানত? কারণ তার সামান্য জীবনে যাদের সঙ্গে জানাশোনা, তারা প্রায় সকলে তারই মত অবস্থার লোক।

ধরো, সকালে উঠেই সত্যিকারের মাখন দেওয়া একখানা টোস্ট্ কিম্বা ছুখানা ভাল বিলিতি বিস্কুট; তার সঙ্গে চা—এক পয়সা প্যাকেটের গুঁড়ো চা নয়—দামী দার্জিলিং চা, তাতে ঘরের গরু বা মোষের ছুধ এবং চিনি ইচ্ছামত। সেইটেই ওর কাছে সব চেয়ে লোভনীয় বলে মনে হয়। ভয়ে ভয়ে সইয়ে সইয়ে দেখত প্রথমে যে, কতটা পর্যন্ত ছুধ তারা বিনা আপত্তিতে দেবে—এখন সে নির্ভয়ে চায়, আধ কাপ ছুধ দিতেও তাদের কোন বিরক্তি দেখা যায় না। তারপর দশটায় ভাত—ধপ্ধপে আতপ চালের ভাত, ছুখানা খুব নরম রুটি, প্রতি ছু'হাতা ভাতের সঙ্গে এক হাতা করে ঘি (ভেজিটেবল ঘি অবশ্য—কিন্তু তাও তো তার কাছে ছুরাশা! চপ্চপে ক'রে ঘি মেখে ভাত, সে জানত কেবল রাজারা খায়), তার সঙ্গে ডাল, তিনটে চারটে তরকারী, পাঁপর, ছু তিন রকমের আচার, দই ও দহি-বড়া।

দই-র সঙ্গে চিনি ইচ্ছামত। এরা জৈন, মাছ মাংস খায় না, তাতে কিন্তু অসীমেরও খুব কষ্ট নেই, কারণ মাছ যে কী রকম খেতে তা সেও তো ভুলে গেছে বহুদিন। এর পর আবার দুটোর সময় শুধু এক কাপ চা, ভাত খেয়ে অফিসে এসে বসলে এক গ্লাস বরফ জল তো আছেই। চারটেয় পুরি, চাট্‌নি, লাড্ডু ও চা। রাত্রে রুটি বা পুরি (ইচ্ছামত), ডাল, তরকারী, চাট্‌নি, দহি-বড়া—এছাড়া, কথাটা ভাবলেই অসীম কেমন হয়ে পড়ে, পায়স বা ক্ষীর কিংবা বড় একবাটি দুধ প্রত্যহ। এরপর আরও দু ঘণ্টা অফিসের কাজ সেরে সে যখন শুতে যায়, তখন নেয়ারের খাটিয়ায় পুরু জাজিম-পাতা বিছানা এবং একটি পাখা—বিশেষ করে তারই মাথার ওপর, সম্পূর্ণ তারই জন্য একটা গোটা পাখা—অপেক্ষা ক'রে থাকে। ছেঁড়া মশারি টাঙাতে হয় না, অর্ধেক রাত্রে উঠে মশা বা ছারপোকা মারার হাঙ্গামা নেই। গরমে ছটফট করার কথা তো ভুলতেই বসেছে।

এ যদি স্বর্গ-সুখ না হয় তো স্বর্গ-সুখ যে খুব বেশী লোভনীয় তা অসীম মনে করে না।

এর সঙ্গে ওর বাড়ির অবস্থাটা? এতদিন বাদে মাইনে বেড়ে বেড়ে মাগ্‌গী-ভাতা সুদ্ধ দাঁড়িয়েছে পঁয়ষট্টি টাকা। তার মধ্যে ছাপ্পান্ন টাকা তো দু'মণ চাল কিনতেই বেরিয়ে যায়। লোকসংখ্যা খুব কম নয়, মা, স্ত্রী, সে নিজে, একটি খোকা, ছোট ভাই এবং ছোট বোন। শহরতলীতে মাথা গোঁজবার মত একটি বাড়ি আছে এই ভরসা। বাড়িটা অবশ্য জরাজীর্ণ, পড়ো-পড়ো কিন্তু তবু ভাড়া লাগে না, আর তার সঙ্গে সামান্য যা জমি এখনও আছে তাইতে দুটো গাছপালা দিয়ে ডুমুর সজনে ডাঁটা থোড় কচুশাক প্রভৃতির সংস্থান হয়। বাড়িতে তরকারী বলতে ঐ সবই চলছে দীর্ঘকাল ধরে—বাজার করবার মত কিছুই আর হাতে থাকে না। তবু সেই জমি থেকেই দুবার, একবার ওর বিয়ের সময়, আর একবার ছোট-ভাইয়ের টাইফয়েডের সময়—এক টুকরো ক'রে বেচতে হয়েছে। তখন কীই-বা দর

পাওয়া গিয়েছিল, সেটুকু থাকলে আর কিছু ফসল পাওয়া যেত, এখন যা আছে তা থেকে আর একটুও হাতছাড়া করা যায় না। অথচ সংসার যে ক্রমেই অচল হয়ে আসছে এটাও ঠিক। রাগ হয় ওর মায়ের ওপর। এই অবস্থায় তিনি সাত-তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিয়ে বসলেন। ওর তো তখন এত বোঝবার বয়স হয় নি—তাঁরই ভেবে দেখা উচিত ছিল। পঁয়ষট্টি থেকে ছাপ্পান্ন গেলে থাকে তো ন'টি টাকা, এতকাল আবার তা থেকে মান্থলি টিকিট কিনতে হ'ত। সত্যি সত্যিই তো জাতুমন্ত্রে সংসার চলে না, বাজার ছাড়াও হরেক রকমের খরচ আছে। ওর বৌ সামান্য যে আট-ন ভরি সোনা নিয়ে এসেছিল তা চলে গেছে। মার কাছে বিশেষ কিছু ছিল না, যা ছিল তার মধ্যে কানের মাকড়ী থেকে শুরু করে কোমরের রূপোর গোট পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেছে! এখন আর সোনার গুঁড়ো বলতে বাড়িতে কিছু নেই। ওর শ্বশুরের কাছে পাওনা আংটি, ভাইয়ের পৈতের আংটি সব শেষ করেছে একে একে। এখন যদি ভারী কিছু অসুখ হয় কারুর (ঈশ্বর না করুন) তা হলে বাড়ী বাঁধা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আয় বাড়ানোর আর একটিমাত্র উপায় খোলা আছে, সেটি হচ্ছে ছোট ভাইকে ইস্কুল ছাড়িয়ে কোন কারখানায় দেওয়া। কিন্তু তাতেও মন সরে না অসীমের, ভাইটা লেখাপড়ায় বড্ড ভাল, আর সেই জন্যই ইস্কুলে ফ্রী পড়ে, ইস্কুলেরই পুয়োর ফাণ্ড থেকে তাকে বই-খাতা দেয়। এ অবস্থায়, পাশ করার আর মোটে একটা বছর থাকতে ছাড়িয়ে নেবে? অথচ কীই বা করে! শুধু তো ভাত নয়—কাপড় আছে, জামা আছে, টেক্স খাজনা আছে। ধার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে দু-তিন জায়গায়। আকাশ ফুঁড়ে আর কিছু টাকা আমদানী না হলে কোনও আশা নেই!

এই অবস্থায় হঠাৎ, এই মনিবের লেকের ধারের প্রাসাদোপম বাড়িতে এসে থাকা এবং তাঁরই ওখানে খাওয়ার প্রস্তাবটা, হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরার মত বৈকি! শুধু যে কল্পনাতীত রকমের ভাল

খাওয়া তাই তো নয়। একটা লোকের খাওয়ার খরচটা যদি বাড়িতে বেঁচে যায় তাও বা মন্দ কি? তা ছাড়া, তার খোদ মনিব আকারে ইঙ্গিতে ভরসা দিয়েছেন যে, সে যদি মন দিয়ে কাজ ক'রে এই বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে দিতে পারে তো তিনি আগামী পূজোর সময় কিছু বোনাস দেবার চেষ্টা করবেন। মনিব ভালই বলতে হবে, এই সেদিন অর্থাৎ গতবৎসর ছেলের বিয়ের সময় পুরো এক মাসের মাইনে (মাগ্‌গী ভাতা বাদ) বোনাস দিয়েছেন, তাছাড়া দিয়েছেন নতুন ধুতি-পাঞ্জাবী, মায় নতুন জুতো পর্যন্ত। এবারও তার অত্যন্ত মলিন এবং শতছিন্ন ধুতির চেহারা দেখে একজোড়া মিলের ধুতি তাকে আনিয়ে দিয়েছেন নিজেই উপযাচক হয়ে। হয়ত সেটা তাঁর বাড়ি এবং নিজস্ব অফিসের মর্যাদা রাখবার জন্যই—তবু অত কথা ভেবে দেখার দরকার কি অসীমের? পেয়েছে এই কত। হয়ত এবারও এক মাসের মাইনে বোনাস দেবে। অবশ্য মন দিয়ে কাজ করার অর্থ হল—সাড়ে সাতটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত ভূতের মত খাটা, শুধু দু-তিনবার স্নানাহারের অবসর বাদ; সেইজন্যই বাড়িতে এনে রাখার ব্যবস্থা কিন্তু তাতে অসীমের অন্তত কোন ক্ষোভ নেই, কী-ই বা করত সে কাজ না করলে? এখানেও যেমন তার বন্ধুবান্ধব নেই, পৃথিবীর অন্য কোথায়ও তেমনি নেই। বন্ধুবান্ধব থাকাটাও একটা বিলাস, তার মত গরীবের সে বিলাস করার সামর্থ্য কৈ? সুতরাং শুধু শুধু চুপ ক'রে বসে না থেকে এদের কাজ একটু করলেই বা ক্ষতি কি? বিশেষত এরা যখন এত যত্ন ক'রে এখানে রেখেছে, এত ভাল ক'রে খাওয়াচ্ছে!

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, এখানে আরও অনেক কর্মচারী আছে আর তাদের সকলকার জন্যই এই রকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এবং সে শুনেছে যে, মনিবরা নিজেরা যা খান তাতে তাঁদের প্রতি একজনের খরচে এদের সাত আটজনকে এই রকম আড়ম্বর ও প্রাচুর্যের সঙ্গে খাওয়ানো যায়। তবু সে খুবই চরিতার্থ বোধ করে নিজেকে,

কৃতজ্ঞ না হয়ে পারে না। আর কেউই অত খাটে না, বরং তাকে নানারকম বিদ্রূপ করে, আহাম্মক বলে হাসাহাসি করে—তবু অসীম মনে করে যে, তার যখন এমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না তখন একটু খাটতে দোষ কি? এমন বাড়িতে থাকতে পেলে এবং এমন খেতে পেলে সে কুড়ি ঘণ্টা খাটতে রাজী আছে।

তাছাড়া মনিবেরও যখন এত বিপদ!

বিপদ যে খুবই বেশী, তা সে-ই তো সব চেয়ে বেশী জানে। ওর মনিবদের নানা রকমের ব্যবসা, সেটা যুদ্ধের দৌলতে এমনিই যথেষ্ট ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, তার ওপর তাঁরা চোরাবাজারের পেছনের দোর দিয়ে এই তিন বছরে উপার্জন করেছেন বোধ হয় এক ক্রোর টাকারও বেশী। এ ব্যাপারটা এমন নিঃশব্দে এবং এমন মসৃণভাবে হয়ে গেছে যে সরকার বাহাদুর তার বিন্দুবিসর্গও টের পান নি। ওদের বড় কারখানাটার মধ্যে যে দু-দুটো নতুন তেলের কল এই তিন বছর চলেছিল তার ইতিহাস মাত্র কয়েক হাজার টাকা ঘুষ এবং কিছু তদ্বিরের ফলে ছিল সরকারী কর্তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সব খদ্দেরের সঙ্গেই বলা-কওয়া ছিল, দুটো চালান যেত একসঙ্গে, দুটোই তাঁরা সই ক'রে দিতেন। বড়টা অর্থাৎ আসলটার দামই আদায় করা হত—ছোট চালানটার হিসাব থাকত খাতাপত্রে। সেই খাতাপত্র আয়কর অফিসে জমা দেওয়া হ'ত—ইন্সপেক্টররা এসে দেখতেন অথচ সেটা ছিল আসল আয় এবং আসল কারবারের মাত্র এক অষ্টমাংশের হিসাব।

আসল হিসাবটা জানত তিন চারটি অত্যন্ত নিরীহ এবং বিশ্বাসী কর্মচারী—অসীম তাদেরই একজন। অসীম আবার তাদের মধ্যে ছিল সব চেয়ে কম মাইনে পাবার এবং বেশী খাটবার লোক। কিন্তু ও সেজন্য একটুও দুঃখিত নয়—লেখাপড়া বিশেষ কিছু শেখবার

অবকাশ পায় নি সে, বাবা মরবার পরই ইস্কুল ছেড়ে চাকরীর খোঁজে বেরোতে হয়েছিল। সেদিন কাজকর্ম এবং লেখাপড়া কোনটাই জানত না, ফলে কোথাও চাকরী মেলে নি। একেবারে মরীয়া হয়ে ও এই বড়বাবুরই একদিন পা জড়িয়ে ধরে এখানে কুড়ি টাকা মাইনের চাকরী পেয়েছিল। এঁরাই হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছেন। সুতরাং অসীম জানে যে, সে যা পাচ্ছে তাই ঢের, আর কোথাও গেলে হয়ত এ মাইনেও পাবে না—যদি বা চাকরী পায়। তা বাদেও, কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে তো! ওরা লাখ পেলে কি ক্রোর পেলে তাতে অসীমের ক্ষতি-বৃদ্ধি কি? সে ওদের অদৃষ্ট এবং ব্যবসায়-বুদ্ধি। তার যা পাওয়ার যোগ্যতা, তা তো সে পাচ্ছে—তবে আর তার অসন্তোষের কারণ কি?

হ্যাঁ—হিসাবের কথাটা যা উঠেছে। এদের কোম্পানীটা হচ্ছে লিমিটেড, প্রাইভেট লিমিটেড অর্থাৎ খুড়ো, ভাইপো এবং ভাগ্নে—এই তিন ডিরেক্টর। তার মধ্যে এঁরা যদিও তিনজনেই চোরাকার-বারের ইতিহাসটা জানতেন, বর্তমান মনিব অর্থাৎ খুড়ো এবং মামা (একই ব্যক্তি) নাকি আবার এরই মধ্যে বাকী দুজনকে ঠকিয়ে নিজে কয়েক লাখ টাকা বেশী কামিয়ে নিয়েছেন। সোজা পথে সেটার জন্যে নালিশ করার পথ নেই—কারণ তাহলে সবাই জড়াবে; সুতরাং বাঁকা পথেই তাঁরা নানা রকম মামলা মোকদ্দমা করে এঁকে বিব্রত ক'রে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে সরকারী মহলও আয়কর-প্রবঞ্চনা নিবারণের জন্য যেমন উঠে পড়ে লেগেছেন তাতে সমূহ বিপদ—কোন্ সময় যে কোন্ দিক থেকে বজ্র পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। এক্ষেত্রে নকল হিসাব বা সরকারী হিসাবটা চোস্ত ক'রে রাখা প্রয়োজন, যখন যা খাতা বা হিসাব দরকার হয়, তা-ই সঙ্গে সঙ্গে নকল তৈরী ক'রে ফেলতে হবে, তাছাড়া আসল হিসাবটাও নিজের কাছে থাকা দরকার। সেইজন্যই বিশেষ অফিসটি মানে অন্তরঙ্গ এই চারটি কর্মচারীকে ঘরে এনে পুরেছেন মনিব। কাজ

তো দরকার বটেই—এরা শত্রুপক্ষে বা সরকারী পক্ষে সাক্ষী না দেয়, সেটাও দেখা দরকার। বড়বাবু খুবই পুরানো লোক এবং বিশ্বাসী। তিনি মাইনে পান দেড় শ টাকা, কিন্তু তাঁর পৃথক কমিশনের ব্যবস্থা আছে। তাতে তাঁর বাড়ি-ঘর, মোটা টাকার ইন্স্যুরেন্স এবং একটি রক্ষিতা রাখার খরচ চলে যায়। বাকি তিনটি লোক তাঁরই সংগৃহীত—একেবারে অবস্থা খারাপ দেখে দেখে তিনি চাক্‌রী দিয়েছেন, যাতে তারা একদিনের জন্যও চাক্‌রী ত্যাগ করতে সাহস না পায়। এই সব মোকদ্দমা শুরুর আগে তিনি বলে দিয়েছিলেন ওদের, 'দেখ, ওরা হয়ত এখন লোভ দেখাবে, ডাকবে, চাকরীও দেবে এর চেয়ে বেশী মাইনেতে কিন্তু কাজ চুকে গেলেই লাথি মারবে। তার চেয়ে পুরোনো মনিবকে ছেড়ো না। আর আমি যখন আছি তখন এখানে অন্তত চাকরী যাবার ভয় নেই।' সেই আশ্বাস আর আশঙ্কাতেই ওরা সামান্য মাইনেতে মনিবের এক ক্রোর টাকা বাঁচাবার জন্য প্রাণপণে খাটছে ভূতের মত। বড়বাবুই মনিবকে বলে দিয়েছেন, 'এদের দারিদ্র্য ঘোচাতে নেই, তাহলেই যে যার নিজের স্বার্থ দেখবে। সার্কাসে বাঘকে নির্জীব ক'রে রাখে আধপেটা খাইয়ে—দেখেন নি? খেতে না পেলেই ঠিক থাকবে ব্যাটারা!'

মনিবও সেটা মানেন, তাই দয়া করবার ইচ্ছে থাকলেও চেপে যান।

সব মেঘেরই যেমন রূপোলী লাইন আছে, রূপোলী লাইনেও বুঝি তেমনি মসী-রেখার অভাব নেই।

এখানে অসীমের সব চেয়ে অস্বস্তির কারণ হ'ল মনিবের স্টেনো-গ্রাফার এবং সেক্রেটারী মেমটি। অসীম জানত খাঁটি মেমই, পরে শুনেছিল, তারই মুখে, যে তার মা ছিল য়্যাংলো-বার্মিজ, বাপ

ইউরোপীয়ান। যুদ্ধের সময় রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে এসে এখানেই আছে কিন্তু তাও এতকাল সাহেব-বাড়িতেই কাজ ক'রে এসেছে—কালা আদমীর কাছে চাকরী এই প্রথম। মেম-স্টেনোর কোন প্রয়োজন নেই ওর মনিবের, শুধু ওটাও ঐশ্বর্যের একটা অঙ্গ বলে রাখা। অন্য কী একটা বিলিতি অফিসে গিয়ে ওকে দেখেন মনিব, তারপর তিন গুণ মাইনে দিয়ে ডেকে আনেন। সে অবশ্য এখানে থাকে না, কারণ জৈন বাড়িতে তার আহারাদির ঘোর অসুবিধা। তবে তার প্রয়োজনও নেই—ওর ঘরভাড়া ও আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ই মনিব বহন করেন। মধ্যে মধ্যে প্লেনে চেপে যখন বিদেশে যান কিংবা দার্জিলিং ওয়াল্‌টেয়ার যান হাওয়া বদলাতে, তখন সেক্রেটারী তাঁরই সঙ্গে তাঁরই সমান সম্মানে গিয়ে থাকে। অবশ্য এ নিয়ে মন্দ লোকে কম মন্দ কথা বলে না। কিন্তু অসীম জানে যে, বড়লোকের এসব ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই। তারা পয়সা রোজগার করে তো এই সব শখ-শৌখীনতার জন্যই।

এমন কি, ওদের বিলাস বা ঐশ্বর্যেও কোনদিন অসীম ঈর্ষাবোধ করে নি কিংবা ওর কোন নিশ্বাস পড়ে নি। পয়সা ওরা করেছে সে ওদের কৃতিত্ব এবং ঈশ্বরের দয়া। তাতে তার ক্ষুব্ধ হবার কী আছে? বরং মধ্যে মধ্যে চাকরদের অনুমতি নিয়ে, অন্তঃপুরিকারা বেড়াতে গেলে বাবুদের ঘরগুলো দেখে আসে। মসৃণ পরিচ্ছন্ন মার্বেল পাথরের মেজে, সেখানে বার বার পা মুছেও যেন ঢুকতে সঙ্কোচ বোধ হয়, তার মধ্যে জুঁই ফুলের মত নরম শুভ্র বিছানা। চেয়ার, ডেস্ক, আলমারী প্রভৃতির এক-একটার মূল্যে তাদের মত সামান্য প্রাণীর এক বৎসর সংসার চলে যায়! ঘড়ির দিকেই হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতে হয়—ঘণ্টা বাজে অর্কেষ্টার সুরে। ছবিগুলোই বা কী! এসব ঘরে পাখা নেই, তার বদলে আছে প্রত্যেকটিতে আড়াই হাজার টাকা দামের কয়েকটি বাতাস-প্রেরক যন্ত্র। তার ওপর খসের পর্দা ফেলা আছে, সে পর্দার ওপরে আবার বৈদ্যুতিক ধারাযন্ত্রে

জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা—তাতে প্রতি সন্ধ্যায় এক শিশি ক'রে আতর ঢেলে দেওয়া হয়। সেই সুগন্ধি ভিজা খসের পর্দার মধ্যে দিয়ে যন্ত্রের হাওয়া যখন হু হু ক'রে ঢুকতে শুরু করে তখন দেখতে দেখতে সুগন্ধি ঠাণ্ডা বাতাসে ঘর ভরে যায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে অপলক নেত্রে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অসীম এবং যতদূর সম্ভব নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত ক'রে প্রাণপণে সে-সুবাস নেবার চেষ্টা করে।

বড়বাবুর যেটা নিজস্ব অফিসঘর, সেখানে প্রায়ই যেতে হয় অসীমকে। সেটা এয়ার কণ্ডিশ্যনড্ করা, অর্থাৎ ঘরের বাতাসের তাপ ইচ্ছামত তাতে বাড়ানো কমানো যায়। তাতে আছে আধুনিক ধরণের বিরাট সেক্রেটেরিয়ট্ টেবিল, সেক্রেটারীর জন্য একটা রোলটপ্ ডেস্ক, চামড়া-মোড়া চেয়ার খানকতক, বড়বাবুর চেয়ারে আবার নরম লোমওয়ালা কী জন্তুর চামড়া বিছানো ; একটা চওড়া সোফা, একটা আরাম কেদারা এবং নানা রকমের টেলিফোন যন্ত্র। এ ছাড়া, ছোট্ট রেডিও সেট, ইস্পাতের আলমারী, কম্বিনেশন তালা দেওয়া লোহার সিন্দুক এবং এক আলমারী বই। এমন পুরু কার্পেট পাতা আছে যে, পা দিলে গোছ-সুদ্ধ ডুবে যায়। এই অফিস ঘরে তার মত ময়লা কাপড়, ছেঁড়া জামা ও খোঁচা খোঁচা দাড়ী সুদ্ধ তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়—এইটেই অসীম একটা মস্ত অনুগ্রহ ব'লে মনে করে।

কিন্তু অসুবিধা হয়ে পড়েছে ওর এই অফিস-রূপ-স্বর্গবাসিনী সেক্রেটারীরূপ অপ্সরাটিকে নিয়েই।

এর আগে যে শ্যামাঙ্গী য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটি ছিল সে নাকি অন্য কোন কর্মচারীর সঙ্গে কথাই কইত না, হুকুম করার প্রয়োজন বাদে। অসীমের মনে হয় সে-ই ছিল ভাল। এ মেয়েটি, মেভিস ক্লেয়ার এর নাম, সম্পূর্ণ উল্‌টো। বড়বাবুর মতে ওর মাথায় ছিট আছে। সে অফিস সুদ্ধ বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ করে যেচে, যারা ইংরেজী ভাল জানে না তাদের সঙ্গে ইঙ্গিতে

কাজ সারে। ওদের জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ সম্বন্ধে তার যেন কৌতূহলের শেষ নেই। হুকুম সে করে অনুরোধ করবার মত ক'রে, সৌজন্যবোধ আছে যথেষ্ট। ভারি হাসি-খুশি আমুদে মেয়েটি, বয়স কত তা অসীম আন্দাজ করতে পারে না, জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় না। অনবরতই কণ্ঠে তার গান আছে গুনগুনিয়ে। আর কারণে অকারণে ফাঁক ফেলেই তার সেই খাস অফিসরূপ স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওদের নীচের তলার বড় অফিসঘরে চলে আস্‌বে এবং সকলের সঙ্গে পালা ক'রে গল্প করবে! যতক্ষণ না লোক পাঠিয়ে মনিব ডাকবেন ততক্ষণ সে আর ওখানে ফিরবে না। মনিব সম্বন্ধে তার ভাবটা এতই তাচ্ছিল্য এবং বিদ্রূপের যে, মনে হয় এত টাকা আয়ের চাকরীটার ওপর ওর যেন একটুও মমতা নেই। ওর ভাবভঙ্গী দেখে অসীমেরই বুক কাঁপতে থাকে, ওর ভবিষ্যৎ চিন্তা করে।

এ বাড়িতে আসার তিন চারদিন পর থেকেই যেন মেভিসের পক্ষপাতটা তার ওপর বেশী হয়ে পড়ল। প্রথম প্রথম ওর কথা বুঝতে বিষম বেগ পেতে হ'ত অসীমকে, অথচ সে যে ওর কথা বুঝতে পারছে না এটা জানতে দেওয়া বড় লজ্জার কথা—ফলে মেভিস কাছে এসে দাঁড়ালেই অসীম ঘেমে উঠত, ওর গলা শুকিয়ে জিভ যেন ভেতরে ভেতরে জড়িয়ে যেত কথা বলবার সময়। কিন্তু মেভিস সত্যিই ভাল মেয়ে, সে অসীমের অসুবিধাটা বুঝতে পেরে বেশ আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কথা বলতে শুরু করলে! এখন অসীম ওর সব কথাই বুঝতে পারে, এমন কি উত্তর দিতেও খুব অসুবিধা হয় না। সে পরে বুঝেছে যে গ্রামারের দিকে তত মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই, মেভিস নিজেও খুব ব্যাকরণ-দুরস্ত কথা বলে না: ওর কাছে তো আশা করেই না। কোন মতে শব্দগুলো দিয়ে বক্তব্যটা বুঝিয়ে দিলেই হ'ল। ক্রিয়াগুলো মেভিসই বসিয়ে নিতে পারবে।

তবু, ওর সেই দুধে-আল্‌তার মত রং, সুন্দর দামী ছিটের

পোশাক, ফাঁপানো মাজা চুল এবং নখ ও ওষ্ঠের কৃত্রিম লালিমা নিয়ে, চারিদিকের বাতাসে একটা পাউডার ও এসেন্সের মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে যখন পাশে এসে বসত, তখন অসীম তার নিজের ময়লা কাপড়, ছেঁড়া জামা এবং দাড়ী চুলের দুরবস্থা স্মরণ ক'রে প্রত্যেক বারই সঙ্কুচিত ও বিব্রত বোধ করত নিজেকে। এ যেন সূর্যকিরণের রেখা দিয়ে ময়লা আবর্জনা দেখিয়ে দেওয়া। নিজের দারিদ্র্য এর আগে আর অসীমকে কখনও এমনভাবে লজ্জা দেয় নি। কারণ সেই অপরিসীম দৈন্যেই সে চিরকাল অভ্যস্ত। এখানে এসেও এমন কিছু লজ্জার কারণ ঘটে নি, কেন না ক্রোরপতি মনিব ও পঁয়ষট্টি টাকা বেতনের ভৃত্যের জীবনযাত্রায় যে পার্থক্য থাকবে তা তো জানা কথাই। কিন্তু মেভিস সম্বন্ধে তার মনের সেই স্থৈর্য কেন যে বার বার এত বিচলিত হয়ে পড়ে তা সে নিজেই বোঝে না। মেভিস মাইনে পায় তার আটগুণ, আয় আরও ঢের বেশী। তার অবস্থাও মেভিসের জানতে বাকী নেই, বেশভূষা দেখেই সে পাশে এসে বসে যখন, তখন তার এ অহেতুক লজ্জার যে কোন কারণ নেই তাও সে জানে—তবু সমস্ত কার্য-কারণ ও যুক্তি-তর্কের অতীত মন যথাসময়ে সব ভুলে আবারও কুণ্ঠিত ক'রে তোলে তাকে।

মেভিস হয়ত তার এই সামান্য অবস্থার জন্যই দয়া করে তাকে, হয়ত কেন—নিশ্চয়ই।

প্রথম দিনের পরিচয়টা ওদের বেশ মনে আছে অসীমের। এখানে আসবার বোধ হয় তিনদিন কি চারদিন পরেই হঠাৎ মেভিস এসে সেই প্রশ্নই ক'রে বসল, 'বাবু, তুমি দিনরাত এমন বসে বসে খাতা লেখ কেন? তোমাকে ওরা যা লজ্জাকর মাইনে দেয় তাতে এক ঘণ্টার বেশী কাজ করা উচিতই নয়।'

বিব্রত অসীম কষ্টে উত্তর দিয়েছিল, 'কীই বা করব বলো, কাজ না ক'রে। চুপ ক'রে বসে থাকতে হবে তো?'

'তা হোক। তাই বলে অকারণে মস্তিষ্ককে এমন ভারাক্রান্ত

করবে ? বিকেলে একটু একটু বেড়িয়ে এলেও তো পারো। স্বাস্থ্য থাকবে কেন ঘরের মধ্যে বসে বসে এত খাটলে! তোমাকে ওরা পেয়েছে যেমন বোকা!'

সেদিন এর পরও কী সব উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ভাল ক'রে কিছুই গুছিয়ে বলতে পারে নি, তা মনে আছে অসীমের। এর পরের দিন দুপুরে এসে মেভিস জোর ক'রে ওর খাতা বন্ধ ক'রে দিয়ে বলেছিল, 'রাখো দেখি তোমার খাতা। একটু গল্প করো। তোমার ঘরের কথা বলো। তুমি বিয়ে করেছ ?···হে ঈশ্বর! বলো কি— ছেলে আছে ? মা, ভাই, বোন ? আর এই তুচ্ছ আয় ?'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলেছিল মেভিস, 'জোর ক'রে মাইনে বাড়িয়ে নিতে পারো না, এদের চাপ দিয়ে! এই তো সুযোগ।'

অসীম ভয়ে ও কুণ্ঠায় আড়ষ্ট হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'কিন্তু তাই কি উচিত ? বিপদের সুযোগ নিয়ে—বিশেষত খুব দুঃসময়ে ওরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল ; আর এমন কিছু খারাপ ব্যবহারও তো করে নি!'

'খারাপ ব্যবহার করে নি—বলো কি ? এ কম মাইনে দেওয়াটাই তো অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত! লজ্জা করে না ওদের ? জানোয়ার সব!'

আরও এমনি ধরণের ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা। অসীম বসে বসে ঘামে আর আড়চোখে চায়, কে এসব কথা শুনছে এবং কী-ই বা মনে করছে!

তাও তবু একরকম চলেছিল কিন্তু এর পরের দিন পাঁচটার সময়, মনিব কি একটা পারিবারিক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার অবসরে, যখন মেভিস হঠাৎ এসে প্রস্তাব করল, 'চল বাবু একটু বেড়িয়ে আসি!' তখন অসীমের মনে হল সীতার মত তার পাতাল প্রবেশের সুযোগ থাকলে সে বেঁচে যেত। এই বেশভূষা নিয়ে মেমের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া ? পাগল নাকি!

সে কী একটা ওজর দেবার চেষ্টা করল কিন্তু মেভিস তার কোন কথাই শুনল না, হাত ধরে টেনে নিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়। আরও চূড়ান্ত হ'ল, যখন লেকে খানিকটা বেড়াবার পর হঠাৎ একটা রিক্সা নিয়ে ছোট লেকের মধ্যে ঢুকে পড়ে রিক্সাওয়ালাকে বলল টালিগঞ্জের দিকে চালাতে! ইস্, এই ময়লা ও ঘামের গন্ধওয়ালা জামা নিয়ে সঙ্কীর্ণ রিক্সায় ওর সঙ্গে ঘেঁষা-ঘেঁষি করে বসা! আগে তবু এদিকটা ভীড় কম থাকতো, এখন যুদ্ধোত্তর কলকাতাতে ভীড় কোথাও কম নেই। লোকগুলো হাঁ করে তাকিয়ে দেখে এবং নানারকম জল্পনা কল্পনা ও হাসাহাসি করে। অসীম বেচারী তো একবারও লজ্জায় মাথা তুলতেই পারল না। মেভিস কিন্তু নির্বিকার, সে বকেই চলল সারা পথ।

এর পর থেকে মেভিস হয়ে উঠল ওর জীবনে বিভীষিকা। সে মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে পরের দিন সারা সকালটা, যেন তার সঙ্গে ওর আর চোখোচোখি না হয়, মেভিস যেন ব্যস্ত থাকে কিংবা ওদের য়্যাকাউন্টাণ্ট যুগলকিশোরের সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠে—কিন্তু সে সব কিছুই হল না। তিনটের সময় অফিসে ঢুকে অন্য দু-একজনের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলেই সটান ওর পাশে এসে বসে একটা কাগজের প্যাকেট বার ক'রে বললে, 'বাবু, ভাল স্যাণ্ড্-উইচ্ আছে দুখানা, খাও। আমার লাঞ্চ এনেছিলুম কিন্তু শরীরটা ভাল নেই বলে খাই নি।'

শুধু কি স্যাণ্ড্উইচ্? ডিম, কেক্, আরও কত কি। এখানের নিরামিষ আহার ওর বরদাস্ত হত না বলে বরাবরই বাড়ি থেকে লাঞ্চ নিয়ে আসত ও। কিন্তু সে সব সুখাদ্য—যা অসীমের শুধু নামেই শোনা ছিল এতকাল—কিছুমাত্র স্বাদু লাগল না তার কাছে আজ।

কারণ লজ্জা ও সঙ্কোচে সমস্তগুলো গলার কাছে ডেলা পাকাতে লাগল।

আর ওর যেটা আশঙ্কা ছিল তাই ঘটল! মেভিস চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে বিদ্রূপ বর্ষণ শুরু হল। সব চেয়ে যাঁকে ওর ভয়, সেই বড়বাবুর কাছ থেকেই আক্রমণটা এল সব প্রথমে। ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি অনেকক্ষণ থেকেই ক্রূর হয়ে ছিল, তিনি এখন কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক রকমের মধু টেনে এনে বললেন, 'দেখো হে ছোকরা, হাত বাড়িয়ে সূর্য ধরতে গেলে শুধু হাত নয়, দেহটাই পুড়ে যাবে। ও হ'ল ঠাকুরের কলা, ওতে কুকুরের মুখ দিতে নেই।'

যুগলকিশোর বললে, 'যাই বলুন ভূতনাথদা, ঐ রকম কাপড় জামা পরে থাকে তাই, আমাদের অসীমের চেহারাটা তো আর খারাপ নয়। দাড়িটাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়ে থাকলে ওকেই আপনারা সুপুরুষ বলতেন।'

অসীম প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'ও সব কী যা-তা বলছেন যুগলদা, আমার এই অবস্থা দেখেই ওর একটু দয়া হয়েছে—সত্যিই, ভিখিরীকে দয়া করছে বৈ তো নয়।'

মুকুন্দ ছেলেমানুষ, কলেজেও পড়েছিল বছর-খানেক, সে শুধু অসীমকে সমর্থন করলে, 'সত্যিই তো ভূত্‌দা, ওর কী দোষ, ও তো এড়াবারই চেষ্টা করে।'

বড়বাবু শুধু বললেন, 'হুঁ।'

পরের দিন কী একটা কাজে যেতে হল ডালহাউসী স্কোয়ার। অফিসেরই কাজ। সেখানে ওদের রেজিস্টার্ড অফিস, কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে, অসীমকেই যেতে হয়েছিল। ফেরবার পথে একটা ছেঁড়া চটের থলিতে খাতাপত্রগুলো ঝুলিয়ে নিয়ে ট্রামের অপেক্ষা করছে, এবং কেড্‌স্ জুতোর তলাটা ফুটো হয়ে গেছে—তার মধ্যে থেকে গরম পেভমেণ্টে পা ঠেকে পুড়ে যাচ্ছে বলে মধ্যে মধ্যে

ডান পা-টা তুলে একটু আরাম পাবার চেষ্টা করছে, এমন সময় পেছন থেকে অতি পরিচিত কণ্ঠের ডাক, 'ওসীম, ওসীম !'

মেভিস এখানেও ! একেবারে কাছে এসে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াতে ও অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার, তুমি এখানে ?'

মেভিস হেসে বলল, 'আমার আজ ছুটি নেওয়া ছিল এবেলাটা। আমার এক বোন থাকে এখানে, তার সঙ্গে দেখা ক'রে লাঞ্চ খেয়ে এই বেরোচ্ছি। তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন ? ট্রামের জন্যে ? সিলি। এখনই ফিরে গিয়ে সেই ঘানিগাছে লাগতে হবে না। চলো একটু কোথাও যাই। সিনেমায় যাবে ?'

কী সর্বনাশ ! তাড়াতাড়ি অসীম বলে ফেললে, 'সিনেমা আমার ভাল লাগে না।'

তিনটের শো হ'লেও ভাঙতে সেই ছটা—কী কৈফিয়ৎ দেবে অফিসে ?

কিন্তু ততক্ষণে ওর বাহুমূলটা চেপে ধরে ওকে আকর্ষণ করছে মেভিস, 'মেট্রোতে খুব হাসির ছবি আছে একটা, দেখবে চলো। সঙ্গী খুঁজছিলুম কাউকে, ম্যাগিকে বললুম, তা ওর অফিসে আবার ডিরেক্টারের মিটিং।'

শরৎচন্দ্রের ভাষায় 'কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে আকর্ষণ করে', মেভিস তেমনিভাবে ওকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললো মেট্রোর দিকে। আজ অসীম বরং একটু দৃঢ় ভাবেই আপত্তি জানাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। ওর সব যুক্তিই মেভিস হেসে উড়িয়ে দিলে।

শেষে একেবারে পেছনের সীটে আধোআলো-আধোঅন্ধকারে পাশাপাশি বসে অসীমের যেন খানিকটা ভরসা হয়, সে সব সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়ে প্রশ্ন করে, 'আমার মত এত গরীব, এত ময়লা কাপড়-জামাওলা লোককে পাশে বসিয়েছ, তোমার এতে কোন লজ্জা বোধ হচ্ছে না ?'

'কেন ?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে মেভিস, 'লজ্জা কিসের ? তুমি আমার লাভারও নও, ফিয়াঁসেও নয়—লজ্জা করবে কেন ? পৃথিবীর সকলকেই যে ধনী হতে হবে, এমন তো কোন মানে নেই। গরীব লোক কি কারুর বন্ধু থাকতে পারে না ?'

'কিন্তু', তবুও সসঙ্কোচে বলে অসীম, 'কিন্তু তুমি যে আমাকে এত দয়া করো, এতে আমি বড় সঙ্কুচিত বোধ করি—আর বাকী সকলেই বা কি মনে করে বলো দেখি ? হয়ত মনিবও এতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন। আমার যা অবস্থা সেই মত থাকাই কি উচিত নয় ?'

'সিলি ! সঙ্কোচের কি আছে ? আর মনিব ? তাঁর কাছে এখন তুমি আমার চেয়ে বেশী মূল্যবান। নাও, ছবি শুরু হল, দেখ মন দিয়ে—'

সিনেমা থেকে বেরিয়ে মেভিস একটা ট্যাক্সি ডাকল। অফিসের ছুটির সময়—এখন বাসে ওঠা যাবে না, এই হল তার যুক্তি। অসীমেরও প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না, একে তো দেরি হয়ে গেছে, তাতে বাসে ক'রে ফিরতে হয়ত আরও বিস্তর দেরি হয়ে যাবে। যদি কেউ রাগ করে ? এমনিই তো যেন অফিস-সুদ্ধ সকলকেই ওর ভয়। সকলকে খুশি রাখবার জন্যই ব্যস্ত ও।

গাড়িতে বসে চলতে চলতে মেভিস আজ ওর বাড়ির সব খবর নিতে লাগল। ঠিক কে কে আছে, বাড়ি-ঘর আছে কিনা, কত আয় ব্যয় ইত্যাদি। হু হু বাতাসে মেভিসের শ্যাম্পু-করা নরম রুক্ষ চুল উড়ে এসে লাগে ওর গায়ে, তার সঙ্গে এসেন্স ওডিকলোঁন পাউডারের একটা মিশ্রিত সৌরভ ওকে যেন উন্মনা করে দেয়। তবু অসীম একে একে সব কথাই খুলে বলল। এত দারিদ্র্য চেপে যাওয়ারই কথা, এ সব ক্ষেত্রে অনেকেই হয়ত খানিকটা গোপন করত, কিন্তু মেভিসের মধ্যে অসীম কোথায় একটা সত্যকার সহানুভূতির সুর পেয়েছে, পেয়েছে একটা প্রশ্রয়—সুতরাং সে কিছুই গোপন

করল না। ওর সেই অবিশ্বাস্য রকমের দারিদ্র্যের ইতিহাস শুনতে শুনতে মেভিসের দৃষ্টি এক সময়ে ঝাপ্‌সা হয়ে এল—অসীমের ডান হাতটার ওপর নরম শুভ্র বাঁ হাতখানা রেখে গাঢ়স্বরে শুধু বার বার বলতে লাগল, 'ও ডিয়ার, ডিয়ার—মাই পুয়োর চাইল্ড্‌। সো সরি, রিয়ালি!'

এর পর যেন আর মেভিসের সঙ্গটা ততো অসহ্য লাগে না। সঙ্কোচ ও লজ্জাটা ক্রমেই কমে আসে—যদিচ তবু, আজকাল স্নান করবার সময় সপ্তাহে ছু দিনই কাপড় জামায় সাবান দেয় অসীম, সহকর্মীদের বিদ্রূপ সহ্য ক'রেও। মেভিসও, বোধ হয় ঠাণ্ডা মাথায় সবটা ভেবে দেখে, আজকাল আর অত ঘন ঘন নিচের অফিসে আসে না। তবে, লাঞ্চের ভাগটা প্রায়ই বেয়ারা কী চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ওর কাছে, খবরের কাগজে মুড়ে।

এইভাবে কয়েক দিন কাটবার পর হঠাৎ একদিন দেশের একটি লোক টেলিফোন ক'রে জানাল, অসীমের খোকার বড্ড অসুখ, বাঁচা কঠিন। অসীম যেন অবিলম্বে গোটা ছুই ওষুধ এবং সম্ভব হলে এক শিশি হরলিক্‌স্‌ নিয়ে একবার বাড়ি যায়।

অসীমের মুখ শুকিয়ে গেল। পরনের কাপড় ছাড়া আর বিক্রি করবার মত কিছুই নেই যে। তবু কিছু নিয়ে যেতে পারুক বা না পারুক—নিজের একবার যাওয়া দরকার। তখনই বড়বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল করুণ মুখে, ছুটো তিনটে দিনের ছুটি এবং গোটা-দশেক টাকা আগাম মাইনে চাই, যদি প্রয়োজন বুঝে ভূতনাথবাবু দয়া করেন!

ভূতনাথ দা প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, 'ছুটি! ছুটি এখন কি ক'রে হবে? সব কাজ বন্ধ ক'রে তিনদিন আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকব

নাকি! টাকা বরং স্লিপ দিচ্ছি নিয়ে যাও, মোদ্দা আজ রাতটা বাড়িতে থেকে কাল ভোরেই ফিরে এস।'

অন্য সময় হ'লে অসীম আর এর ওপর কথা কইতে সাহস করত না, হয়ত এটুকু বলাই অসম্ভব ছিল, কিন্তু এই কদিনে মেভিস বার বার ওর মাথায় একটা কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে যে অসীমের এই চাকরীটা যত প্রয়োজন তার চেয়ে এই চাকরীটার ঢের বেশী প্রয়োজন ওকে—সুতরাং সে বার কতক মাথা চুলকে প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেললে, 'আমার কাল ভোরেই আসা সম্ভব হবে না বড়বাবু, দুটোদিন না দেখে আসতে পারব না! তাতে যা হয় হবে।'

ওর এই কণ্ঠস্বরেই যেন বড়বাবুর সুর পাল্‌টে গেল। বিস্মিত হয়ে তাকালেন বটে, কিন্তু আর প্রতিবাদও করলেন না। বললেন, 'যাও, মোদ্দা আর বেশী দেরি ক'রো না, দেখছ তো অবস্থা! আর হাতের কাজটা তুলে দিয়ে যাও।'

মেভিসের পরামর্শের আশ্চর্য ফল দেখে অসীম অবাক হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ওকে নমস্কার জানাতে জানাতে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। মেভিস সত্যিই দেবী, মেভিসের তুলনা নেই।

ভক্তের স্তুতি যেন দেবীর কাছে পৌঁছে গেল! সবে সীটে এসে বসে কলমটা তুলে নিয়েছে অসীম, গুন গুন ক'রে গান গাইতে গাইতে এক ঝলক দমকা বাতাসের মত ঘরে ঢুকল মেভিস স্বয়ং। আজ একেবারেই ওর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'ওসীম চলো একটু বেরুই। পাঁচটা তো বেজে গেছে।'

অসীম ভয়ে ভয়ে একবার বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি আজ আর তোমার সঙ্গে যেতে পারব না মিস ক্লেয়ার, আজ এখনই বাড়ি যাবো, এই হাতের কাজটা সেরে।'

'বাড়ি যাবে? হঠাৎ?'

'ছেলের বড় অসুখ। বাঁচে কি না সন্দেহ।' বলতে বলতে অসীমের চোখে জল এসে গেল। সে সব খবরটাই, যা এইমাত্র পেয়েছে, খুলে বলল।

'মাই গড! আর তুমি এখনও খাতা নিয়ে বসে? এই মুহূর্তে ওঠো, না না, কোন কথা নয়। বড়বাবু কিছু মনে করবেন না। উনিও তো ছেলের বাপ। মনিব অপেক্ষা করতে পারবেন—কাজও, কিন্তু অসুখ অপেক্ষা করবে না।

সে জোর ক'রে ওর কলমটা কেড়ে নিয়ে খাতাটা বন্ধ ক'রে দিলে। বড়বাবু সব দেখেও প্রতিবাদ করতে পারলেন না। মনিবের ওপর সেক্রেটারীর প্রতিপত্তিটা তিনি অনুমান ক'রে নিয়েছিলেন বহুদিনই। বরং নিজেই ক্যাশ থেকে দশটা টাকা বার ক'রে দিলেন অসীমের পূর্ব-প্রার্থনা-মত।

মেভিস রাস্তায় বেরিয়ে বললে, 'দাঁড়াও একটা ট্যাক্সি করি। আমারও বেড়ানো হবে, তোমাকেও পৌঁছে দেওয়া হবে।'

পথে বাথগেটে গাড়ী থামিয়ে নিজেই ওষুধ কিনলে, পথের ধারে একটা বড় দোকান থেকে বেশী দাম দিয়ে হরলিক্স্—তারপর নিউ মার্কেটে ঢুকে ফল খেলনা কিনে গাড়ির ভেতরটা প্রায় বোঝাই ক'রে ফেললে।

অসীম ব্যাকুলভাবে বললে, 'এ কত খরচ করছ, এ সব কি করছ তুমি? এত কি হবে, একটা তো ছেলে!'

'তা হোক, দরকারে লাগবে বৈকি! আমার নাম ক'রে দিও তোমার ছেলেকে, বিশেষ ক'রে এই ডল্‌টা। আর এই পাউডারটা নিয়ে যাও, বোনকে দিও!' নিজের হাত-ব্যাগ থেকে ছোট্ট সোনালি পাউডারের কৌটোটা বার ক'রে ওর প্রায়-অসাড় হাতের মধ্যে গুঁজে দিলে।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'অসুখ ভাল ক'রে সেরে

না গেলে এখানে আসবার দরকার নেই, চাকরীর জন্য ভেবো না। চাকরী তোমার ঠিক থাকবে। তুমি ছাড়তে চাইলেও চাকরী তোমাকে ছাড়বে না।···আর ছ্যাখো, তোমাকে আরও একটা সদুপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, এই সব ক্রোরপতিদের মত অকৃতজ্ঞ কেউ নেই —কাজ ফুরোলে আর মনে ক'রে রাখবে না। এই বেলা যত পারো আদায় ক'রে নাও। অন্তত মাইনে তো খানিকটা বাড়িয়ে নাও।··· চারদিন দেশে বসে থাকলেই দেখবে ওঁর ঐ প্রকাণ্ড গাড়ী তোমার দেশের গলিতে ঢুকছে। আর তো এ সব কথা বলতে পারব না, তাই সব আজ বলে নিচ্ছি। এ চাকরী আমি কাল-পরশুর মধ্যেই ছেড়ে দেব।'

চমকে, প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অসীম, 'সে কি? কেন?'

'ভাল লাগছে না। এ যেন আমার আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে। ঐ ভুঁড়িদাস ক্রোরপতিটাকে আমি বুঝিয়ে দেব যে, টাকা দিয়ে পৃথিবীতে সব কিছু কেনা যায় না। ভেরি ব্যাড্ ম্যান!'

হঠাৎ যেন অসীমের মনে হ'ল সে বড় অবসন্ন হয়ে পড়ছে। যেন মস্ত বড় একটা অবলম্বন চলে যাচ্ছে তার, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। সে কি তবে এই ক-দিনেই মেভিসকে আশ্রয় বলে ধরে নিয়েছিল?

অনেক চেষ্টায় সে শুধু বললে, 'ফিরে এসে কি আর দেখতে পাবো না তোমাকে?'

'বোধ হয় না।'

'আর দেখাই হবে না? কখনও না?'

'কে জানে! কোথায় চাকরী পাই আবার, ঠিক তো নেই। মনে করছি বোম্বাই চলে যাবো।'

ততক্ষণে গাড়ি হাওড়া স্টেশনে এসে গেছে। মেভিস ওর জিনিসপত্রগুলো কতক পকেটে, কতক থলিতে, বাকী সব হাতে গুছিয়ে তুলে দিয়ে অকস্মাৎ ওর মুখখানা দুহাতে ধ'রে কাছে এনে,

লঘু কৌতুকভরেই যেন, ওর মুখে ঠোঁটের ওপর একটি চুমো খেয়ে বললে, 'গুড বাই, মাই ডিয়ার বয়! মাই সিলি, ইনোসেন্ট, ডার্লিং বয়! গুড বাই!'

গাড়ির দরজা খুলে বিস্মিত হতভম্ব অসীমকে একরকম ঠেলেই নামিয়ে দিলে মেভিস।

স্টেশন ছাড়িয়ে আধ-পাকা রাস্তা চলে গেছে তুধারের বাঁশ ঝাড় কচুবন ও পানা-পুকুরের মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে ওর ঝাপ্‌সা দৃষ্টি পথ দেখতে পায় না, বার বার হোঁচট খায়। তবু ওর সে দিকে লক্ষ্য নেই। এক রকম বিহ্বল বিমূঢ়ভাবেই পথ চলেছে। এ ওর কী হ'ল? এতদিনের অপরিসীম তুঃখকে ও নিজের প্রাপ্য বলে সহজে মেনে নিয়েছিল, তাই ওর চিত্তের ভারসাম্য কখনও নষ্ট হয় নি। আজ কিন্তু সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। নিজের দৈন্য—বিদ্যা ও বিত্তের—আজ যেন ওকে বার বার ধিক্কার দিচ্ছে। নিজের অকিঞ্চিৎকরতা আজ যেন প্রথম ওকে অভিভূত ক'রে তুলেছে।

ও দরিদ্র, দয়া পাওয়া ওর অভ্যাস আছে। মেভিসের অবস্থা আর ওর অবস্থায় এতই তফাৎ যে ভিক্ষা মনে ক'রেই মেভিসের দয়াটা ও মেনে নিয়েছিল—সকলের বিদ্রূপ ওকে বিব্রত করেছে কিন্তু বিচলিত করতে পারে নি। আজ প্রথম ওর মনে একটা নিদারুণ সংশয় দেখা দিয়েছে—তবে কি মেভিসের আচরণ সবটা ঠিক দয়া নয়, অনুগ্রহের সঙ্গে কি তবে স্নেহও মেশানো আছে একটু? সে স্নেহ সাধারণ বন্ধু বা ভগ্নীর স্নেহ ছাড়াও একটু বেশী, আর একটুখানি গভীর? তবে কি—

চলতে চলতে উদ্‌ভ্রান্তের মত থমকে দাঁড়ায় ও।

একথা কেন মনে হচ্ছে ওর? কাপড় জামা আজও সেই রকমই নগণ্য, মলিন; তিনদিন দাড়ি কামানো হয় নি। দেহের গঠন ও গাত্রের বর্ণ, মুখের শ্রী ও সৌষ্ঠব বহুদিন দারিদ্র্যের চাপে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলেই ওর বিশ্বাস—বেশভূষার দৈন্যে অন্তত চাপা তো পড়েইছে। আর তা না হ'লেই বা কি, মেভিসের মত সুশ্রী মেয়েকে আকর্ষণের কি থাকতে পারে ওর মধ্যে?

না, এ দয়াই। দয়া থেকেই স্নেহ। নিছক নারীর অন্তরের জননী-মূর্তি।

আবার পথ চলতে শুরু করে সে।

কিন্তু ওর চোখ তবু বার বার ঝাপ্সা হয়ে আসে কেন? অনেকদিন আগে ও কী একটা বাঙলা বইতেই পড়েছিল যে সাধারণত বিলেতের মেয়েরা পুরুষকে ঠোঁটে চুমো খায় না—ওটা একটা বিশেষ সম্পর্কের প্রতীক। ছিঃ!···এ ওর কি সংশয়, বামন হয়ে চাঁদ শুধু নয়, বড়বাবুর ভাষায় সূর্য ধরবার চেষ্টা। যা পড়েছে ও, তা হয়ত সত্য নয়—কিংবা রীতি-নীতি বদলে যাচ্ছে ক্রমাগতই। তা ছাড়া মেভিস তো আর ঠিক ইউরোপীয়ান নয়—ওদের সামাজিক প্রথা তার জানবার কথাও নয়।

মনকে এই সব অলস চিন্তার জন্য ধমক দেয় অসীম।

গাছপালার ছায়ায় বেশ নিবিড় হয়ে সন্ধ্যা নামে। ঐ ট্রেনে আর যারা নেমেছিল, ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল, এগিয়ে গেছে বহুক্ষণ! অসীমও জোরে জোরে পা চালায়।

বর্ষার জলে চারিদিকের খানা-পগার একাকার হয়ে গেছে। আবর্জনা, ও বনগাছ-পচার একটা ভ্যাপ্সা, তীব্র দুর্গন্ধ চারিদিকে। এরই মধ্যে ওর সেই জরাজীর্ণ পৈতৃক দুখানা ঘরের একখানাতে তার একমাত্র সন্তান স্যাঁৎসেঁতে মেঝেতে ছেঁড়া কাঁথার ওপর পড়ে রয়েছে। পাশে বসে ছেঁড়া-কাপড়-পরা অনাহার-শীর্ণা তার স্ত্রী ও বুভুক্ষু ভাইবোন।

এই তো ওর জীবন। এই জীবনই ওর সত্য। আগেও ছিল, পরেও থাকবে। এ ইতিহাসের কোন পরিবর্তন নেই। এর ভেতর জন্মেছে সে, কোনমতে পরমায়ুর ক'টা বছর কাটিয়ে এইখান থেকেই একদিন বিদায় নিতে হবে। ততদিন শুধু পরিবর্তনের মধ্যে ভাঙ্গা বাড়ীটার নোনা-ধরা দেওয়াল থেকে হয়ত আর খানিকটা বালি খসে পড়বে। ছাদের চিড়টা আর একটু চওড়া হয়ে যাবে।

এর মধ্যে মেভিস ?

সেদিনের বায়স্কোপ দেখার মতই ছায়া-বাজী। স্বপ্ন। ক্ষণিকের দেখা স্বপ্ন, দ্রুত মিলিয়ে যাওয়াই ভাল স্মৃতি থেকে।

জীবনে এ সব আসে না কোনদিনই, কল্পনাতে থাকে, ঈর্ষা-মাখানো কল্পনা ও দিবা-স্বপ্নে। এ হ'লে মানুষ সুখী হ'ত, তাই স্বপ্ন দেখে মধ্যে মধ্যে। শুধু রূপকথাতেই পড়া যায়, রাজপুত্র এসে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম ভাঙ্গায় কুঁচবরণ কন্যার, পরীরা উড়ে আসে স্বর্গ থেকে রাখাল-বেশী রাজকুমারকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে রাজকন্যার দেশে। ওর মধ্যে কোথাও সত্য নেই।

তবু—তবু এক এক সময় যেন মনে হয় যে, ঐ অস্পষ্ট সংশয়টাই সত্য। মনের সমস্ত সত্তা সেই সংশয়টাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, সে কণ্টক-আলিঙ্গনে সমস্ত বুকটা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়—তবুও। মনে হয়, হয়ত মেভিসই সেই পরী, ওকে জানাতে এসেছে যে এ দীন বেশ ওর ছদ্মবেশ মাত্র, ওর ভেতরে শাশ্বত কালের রাজপুত্র আছে, তারই জন্য পরীর প্রতীক্ষা, তারই জন্য এ অভিসার!

এই স্বপ্ন ও আকুলতার পাশাপাশি ফুটে ওঠে বাস্তবের ছবিটা ; সামান্যা সাধারণ স্ত্রী, দারিদ্র্যে শীর্ণ ও শ্রীহীন। অনাহার ও দৈন্য, আর এই অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দীর্ঘ-প্রসারিত নিজের একঘেয়ে ভবিষ্যৎ জীবন। ক্ষুধার কাছে এই আত্মাবমাননাকর

ক্রীতদাসত্ব। নিজের মনের এই শোচনীয় কারাবাস, এই অসহায় আত্মসমর্পণ।

অকস্মাৎ ওর তুই রগ টন্ টন্ ক'রে আকুল উষ্ণ-অশ্রু নেমে আসে ওর তু-চোখ বেয়ে। সমস্ত পথ, আর তার সঙ্গে যেন সমস্ত জীবনটাও ঝাপ্সা, একাকার হয়ে যায়।

আত্মনিবেদন

ব্রজরাণী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন মেয়েটির দিকে। কোথায় যেন দেখেছেন একে, যেন কতদিন আগেকার ঝাপ্‌সা পরিচয়—বিস্মৃতির পরপার থেকে অনেক দিনের অনেক সুখ-দুঃখ, অনেক স্মৃতি ডিঙ্গিয়ে যেন এ মেয়েটি কোথা থেকে এসেছে! একে চিনি বলতে যেন ভয় করে, অথচ চিনি না বলতেও বুকের মধ্যে কেমন ক'রে ওঠে।

এ কে, এ কে গো!

উনিশ-কুড়ি বছরের ছিপছিপে অথচ নরম চেহারার সুশ্রী মেয়েটি। গায়ের রং শ্যামবর্ণ কিন্তু সে যেন কেমন এক রকমের স্নিগ্ধ শ্যামলতা, যাকে কালো বলে অবজ্ঞা করা যায় না, ময়লা বলে ঘৃণা করা সম্ভব নয়। বড় বড় টানা দু'টি চোখের দৃষ্টি, খুশিতে উজ্জ্বল অথচ আবেগে ঢলো-ঢলো—দীর্ঘ পক্ষ্মের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে হঠাৎ যেন মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। পাত্‌লা দুটি ঠোঁটের মধ্য দিয়ে মুক্তোর মালার মত সাজানো এবং দুধের মত সাদা দাঁত—ক্ষণে ক্ষণে পরিহাসের বিজলী-ঝলকে দীপ্ত হয়ে ওঠে। ঠাট্টা করা তার স্বভাব, হাসি তার নেশা। গোসাঁই বংশের মেয়ে, কীর্তনের পদ তার মিষ্টি গলায় যখন তখন গুনগুনিয়ে ওঠে, তার কোমল রক্তাভ দু'টি পায়ের পাতা যেন সর্বদা নৃত্যে উন্মুখ। হাসি ঠাট্টার অবসরে আপনার আনন্দে সে নেচেও ওঠে বৈকি! তার নাকের ওপরের ছোট্ট তিলকের ঠিক নিচেই সহজাত তিলটি মাত্র দুটি-তিনটি স্বেদ-বিন্দুতে ঘেরা থাকে বারো মাস। সে-দিকে চাইলে পুরুষের রক্তে কিসের একটা চাঞ্চল্য জাগে—তা বোঝানো শক্ত।

হ্যাঁ, একে চেনেন তিনি। বহুদিন আগেকার কথা, তবু পরিচয়

একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। ওর যখন ন' বছর বয়স, তখনকার কথাও তাঁর মনে আছে। সেই বয়সেই ওর বিয়ে হয়। ঢাক ঢোল বাজিয়ে হাতি-ঘোড়ার জলুসের মধ্যে দিয়ে বৃন্দাবনের কোন্ বিখ্যাত মন্দিরের গোসাঁই বাড়ীর কুলবধূ হয়ে ঢোকে, যমুনাপুলিনের ধারে সেই তিন মহল বাড়ীতে। সেদিনের সে উৎসবের স্মৃতি অনেকখানি অস্পষ্ট হয়ে গেলেও ভোলেন নি তিনি।

ওরও নাম ব্রজরাণী।

ঐ চঞ্চলা হরিণীর মত মেয়েটি, যার যৌবনের উচ্ছলতায় তিনি হাঁপিয়ে উঠেছেন—ঐ মেয়েটির মা মাইকেলের কাব্য পড়ে নাম রেখেছিলেন ব্রজাঙ্গনা, বাবা ডাকতেন ব্রজেশ্বরী বলে। আর ব্রজরাণী নাম দিয়েছিলেন ওর শ্বশুর—আশ্চর্যের কথা, তার বহু বৎসর পরে ঐ ব্রজরাণী নামটাই ওর চালু হয়ে যায়। সুরেশবাবু নিজেই চালু করেন ঐ নাম। তাঁর অস্ফুট কণ্ঠে কানে-কানে-ডাকা ঐ নামে সেদিন ওর সর্বাঙ্গ আবেশে এলিয়ে পড়ত।

ন' বছরে বিয়ে হয়ে দশ বছরে বিধবা হয় ব্রজরাণী। তার মাস-দুই পরেই বৃন্দাবনের সে বাড়ী ওকে ছাড়তে হয়। শাশুড়ী ছাড়তে চান নি, কিন্তু সকলের বড় বিধবা এক ননদের অত্যাচারের কাহিনী শুনে ওর বাবা-মা জোর ক'রে নিয়ে আসেন। শ্বশুর সেদিন বলে দিয়েছিলেন, 'এবাড়ীর নিয়ম জানেন তো বেয়াই মশায়, বৌ হয়ে যে ঢোকে সে একেবারে মরে বেরোয়! সুতরাং বৌমা যদি এ বাড়ী থেকে চলে যান তো আমরা ধরে নেবো—।' বাধা দিয়ে বাবা বলে উঠেছিলেন, 'মারা গেছে এই তো? ধরুন না তাই। আপনাদের এক বেলা এক মুঠো প্রসাদ, একখানা থান কাপড় এবং যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা—বেঁচে থাকলেও এর চেয়ে বেশী তো আর আপনারা দিতে পারতেন না। এ বাড়ি থেকে মরে যে বাড়িতে সে জন্মাবে সেখানে ঐ শেষেরটা ছাড়া সবই পাবে। ভয় কি?'

সত্যিই, ভাতের দুঃখ তার বাবার ওখানে ছিল না। ও আর

ওর একটি ছোট ভাই—বাপ-মায়ের এই দু'টি মাত্র সন্তান ; বিধবা মেয়ের ব্যবস্থা তিনি ভালই ক'রে যেতে পারবেন এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তা ছাড়া মায়ের হাতেই কি কম পয়সা ছিল? অভাব ওর হ'ত না কোন দিনই।

বৈধব্যের ব্যাপারটা ব্রজরাণী বোঝে নি কখনও। মাছ-মাংস ওরা কোনদিনই খেতো না, সুতরাং বৈধব্যের বড় দুঃখটা ওর ছিল না। শ্বশুরবাড়ীতেও ওঁরা থান পরতে দেন নি—এখানে ঐটুকু মেয়ের শাড়ী গহনা খোলবার কথা তো কেউ চিন্তাই করে নি। এক অসুবিধা একাদশী। গোস্বামী-মতে একাদশী ওরা বাড়ীসুদ্ধ সবাই করত—সেটাতেও কোন বিশেষ ব্যবস্থা বুঝতে পারলে না ব্রজরাণী। অতএব বৈধব্য শব্দটা ওর অনুভূতির অভিধানে অলিখিত রইল চিরদিনের মত। বিবাহটা শুধু একটা জাঁকজমকের স্মৃতি এবং শ্বশুর-গৃহবাসটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র—ওর মনে এই দু'টি ঘটনার এ ছাড়া কোন অর্থ ছিল না।

কিন্তু এক সময়ে কৈশোর এবং তারপরে যৌবন এল হুড়মুড়িয়ে। ওর দেহের দু'কূল ছাপিয়ে শ্রীর বন্যা বয়ে গেল, মন ভরে উঠ্‌ল অকারণ খুশীর পুলকে। কিসের এ চাঞ্চল্য তা ও বোঝে না—দেহে মনে এ কিসের পরিপূর্ণতা তাও জানা নেই ওর। শুধু একটা কথা ক্রমে ক্রমে ওর মনের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, ওর এই আনন্দের অর্ঘ্য, ওর সমস্ত কিছু আর একজনের কাছে নিবেদন করতে হবে, আপনাতে আপনি থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিবেদন যে কী তা জানে না, কে সে যার কাছে তা সঁপে দিতে হবে তাও জানা নেই—শুধু দিনের পর দিন কিসের একটা প্রতীক্ষা উগ্র হয়ে ওঠে ওর প্রতি রক্তকণায়।

ওর বাবা-মা দেবতার দিকে মন বসাবার চেষ্টা করেন। রাধা-দামোদর গৃহদেবতা, তাঁর সেবা, তাঁর মালা গাঁথা, তাঁর শৃঙ্গার-বেশ তৈরী, এর মধ্যে ওর উদগ্র যৌবন-সক্রিয়তাকে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা

করেন, কিন্তু তা সম্ভব হয় না। ঠাকুর-ঘরের কাজ করে সে ঠিকই, তবে তাতে আর কতটুকু সময় যায়? তার পরের অবসর যে প্রচুর। মা বলেন, ঠাকুরকে চিন্তা কর। পাথরের ঠাকুরকে পূজা করতে হয় তা সে জানে, তাঁকে সেবা করতে হয়, সাজাতে হয়, ভোগ দিতে হয়, একথা ছেলেবেলা থেকেই জানা আছে কিন্তু তাকে নিয়ে চিন্তা করবে সে কি করে? কীই বা আছে চিন্তার? চিন্তা করতে গেলেই তার মন ছোটে বাইরের দিকে—প্রকৃতি, মানুষ, হাসি-খুশির দিকে।

হাস্যে-পরিহাসে প্রাণরসের উচ্ছ্বলতায় উজ্জ্বল এই মেয়েটিকে পাড়ার সবাই ভালবাসত, সব বাড়ীতেই ছিল ওর অবারিত দ্বার। তবু ওর চারপাশের সব কিছু অহরহ ওর আনন্দ-রামধনুর সপ্তবর্ণে যখন চিত্রিত হয়ে উঠত তখন সে রঙ, সে আলো ওকে যেন আর তৃপ্তি দিতে না। ক্রমশ এল একটা শূন্যতাবোধ, একটা অজানা ক্ষোভ। কিসের একটা অতৃপ্তি, একটা হাহাকার!

তারপর?

তারপর যা হয় তাই হ'ল। ভক্ত পূজারীর অভাব ছিল না কোন দিনই, ও-ই বরং তাদের দিকে কখনও ফিরে তাকায় নি। অবশেষে একদিন তাদেরই একজনকে অবলম্বন করে, দেহের তাগিদে নয়, যৌবনতৃষ্ণা মেটাবার ইতর প্রয়োজনে নয়—সুদ্ধ-মাত্র নিজের প্রাণ-বন্যার বেগেই ও একদিন ঘরের বাইরে চলে এল চিরকালের মত। কোন নীতি-জ্ঞান, কর্তব্য-বোধ, বাপ মায়ের কোন স্নেহই সেদিন তাকে ধরে রাখতে পারে নি—এমন কি কোন পশ্চাত্তাপও ওর চিন্তাকে ভারাক্রান্ত করে তোলেনি পরবর্তী জীবনে।

ওর সেদিনকার সে সঙ্গী ছেলেমানুষ ছিল না—এ সব পথ ভাল রকমই জানত। সোজাসুজি কলকাতায় এনে রামবাগানের একটা ঘরে তুলল। ওর শিক্ষা ও সংস্কারে আঘাত লাগবার কথা এতে। কিন্তু কিছুতেই যেন সেদিন ওর কোন ক্ষতি ছিল না। গতানুগতিকতাকে লঙ্ঘন ক'রে ও যে জীবনের নতুন পরীক্ষায় নামতে পেরেছে, নতুন

ক'রে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে পেরেছে, এই আনন্দেই ও মশ্‌গুল। কোন নোংরামি, কোন গ্লানিই ওকে স্পর্শ করতে পারে নি সেদিন।

বরং সে পরিবেশের যারা অঙ্গ, যাদের নিয়ে তার এই নব জীবনের পৃষ্ঠপট রচিত, তারা সেদিন ওকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। 'নবদ্বীপের নতুন মানুষ' 'বিদেশিনী' 'নদের রাণী' এই সব বিশেষণ মিলেছিল ওর সহযাত্রিনীদের কাছ থেকে। বাহিরের নানা উপাদান সংগ্রহ ক'রে ওদের প্রাণের আগুনে ইন্ধন দিতে হয়, তবে তাদের মধ্যে সাড়া জাগে। ওরা এম্‌নিতে স্তিমিত, ক্লান্ত প্রাণকে প্রতিদিন চাবুক মেরে উত্তেজিত করে ওরা। ওরা জানে ফুর্তি—আনন্দের এ সহজ বিকাশ ওদের কাছে অপরিচিত। এ কেমন মেয়ে, প্রতি মুহূর্ত যার দৃষ্টি কৌতুকে উজ্জ্বল, কথায় কথায় যার কণ্ঠে গান ওঠে গুনগুনিয়ে, কারণে অকারণে যার পা ওঠে নেচে? সেদিন ওদের পল্লীর সেই বিশেষ সমাজ ওকে দেখে বিস্মিত হয়েছিল—ওদের একটানা গতানুগতিক জীবনে অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য জেগেছিল ওকে দেখে।

তবুও—এ জীবন ব্রজরাণীর বেশী দিন ভাল লাগে নি। ওর সঙ্গী যখন মাস-ছয়েক পরে ওকে ত্যাগ ক'রে পালাল, তখন সহজ নিয়মেই বেশ্যাবৃত্তি ধরেছিল সে। কিন্তু অল্পদিনেই ক্লান্ত হয়ে উঠল, এ কী জীবন, এই জন্যই কি সে ঘর ছেড়ে চলে এসেছিল? এর মধ্যে সে আত্মনিবেদন কৈ, যার জন্য কৈশোর ও যৌবনের প্রতিটি মুহূর্ত ওর উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেছিল? এ কি বিরক্তিকর আত্মপ্রবঞ্চনা, ভালবাসা পাবার ও দেবার এ কী ব্যর্থ অভিনয়।

ওর অতৃপ্তি যখন চিত্তের পাত্র ভরে উঠেছে, সেই মুহূর্তে সুরেশবাবু এল ওর জীবনে। সমস্ত অন্তর তাকে দেখা মাত্র যেন বলে উঠল 'এই যে, এসেছ!'

সাতাশ-আটাশ বছরের গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহ, সুশ্রী ভদ্রযুবক। ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে,—নিজেও সম্প্রতি ব্যবসায়ে ঢুকেছে। ঘরে স্ত্রী আছে—আট বছর আগেই বিবাহ হয়েছে সুতরাং সে এখন বড় বেশী

পরিচিতা, বড় বেশী পুরাতন। মন নতুনের সন্ধানে, পরিপূর্ণ যৌবনের সার্থকতার আশায় সে-ই প্রথম বাইরে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় তার দেখা ব্রজরাণীর সঙ্গে। অধঃপতনের একেবারে সেই মাত্র সূত্রপাত। সুরেশ তার আগে দু'একদিন বন্ধুদের সঙ্গে এ পল্লীতে এসেছে কিন্তু এ পরিবেশ তার ভালো লাগে নি। তার শিক্ষিত ভদ্র মন যা চেয়েছিল, তা এদের মধ্যে কৈ? এমন সময় অকস্মাৎ, অদৃষ্টের এক বিচিত্র যোগাযোগে ব্রজরাণীর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। সুরেশের মনও অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠল ওকে দেখে—ব্রজরাণীরও তাই। দু'জনেই বুঝতে পারলে কার জন্য তারা এতদিন প্রতীক্ষা করছিল।

তারপর দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর কাটল একটানা নিরবচ্ছিন্ন একটা সুখস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর মতই থাকত তারা, ব্রজরাণী নিজে অপেক্ষাকৃত একটা ভদ্রপল্লীতে বাড়ী কিনেছিল—সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারের মতই বসবাস করত। সুরেশও ব্যবসায়, সংসার এবং ব্রজরাণী এই তিনে ডুবে ছিল। এমন কি, ক্রমে সুরেশের স্ত্রীর সঙ্গেও ওর পরিচয় হয়ে গেল। অন্তরের স্নিগ্ধতায় ব্রজরাণী ক্রমে ক্রমে সে পরিচয়কে সখ্যতায় পরিণত ক'রে তুললে। সুরেশের স্ত্রী চারুবালা ব্রজরাণীর স্বভাব-মাধুর্যে নিজের সহজাত ঈর্ষাকেও যেন ভুলতে বসল।

এই যখন অবস্থা, জীবনের চারিদিকে যখন পরিপূর্ণ সোনালি লাইন টানা, তখন বিপদের সঙ্কেত এল চারুবালার কাছ থেকেই। এ সম্ভাবনা পর্যন্ত কোনদিন ব্রজরাণীর মনে জাগে নি। তাই সে ছিল বাইরের তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। সোজা ঘটনার বাঁকা অর্থ করবার কৌশলও তার জানা ছিল না অবশ্য। চারুবালার অভিজ্ঞতা বেশী, সে-ই একদিন জানাল, নতুন নেশা লেগেছে সুরেশের চোখে, সাবধান!

'এই বুড়ো বয়সে ? ছিঃ ! কী যে বলিস।' সে হেসে উড়িয়ে দিলে। ইদানীং অবশ্য সুরেশের দেখা পাওয়াটা খুবই দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। রাত বারোটার আগে সে কখনই বাড়ী ফেরে না। কোনদিন আসে ব্রজরাণীর কাছে, কোনদিন চলে যায় সটান নিজের বাড়ী। কৈফিয়ৎ দেয়, ব্যবসা বড় হয়ে উঠেছে, অফিস বন্ধ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ কাজ করতে হয়। তা ছাড়া শেয়ার মার্কেটের কাজ রাত্রেই বেশী চলে আজকাল, টেলিফোন ছেড়ে নড়বার উপায় নেই। ব্রজরাণী এত দীর্ঘ দিন ওর কথা বিশ্বাস ক'রে এসেছে যে, অবিশ্বাস করবার কথা সে ভাবতেই পারে না। বিশ্বাস করাটাই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

কিন্তু চারুবালা খবর দিলে যে, ব্যবসা নয়, শেয়ার মার্কেটেও নয়—ওর রাত কাটে আজকাল থিয়েটারেই বেশী। সরোজিনী বলে একটি অল্প বয়সী অভিনেত্রীর জন্য পাগল হয়ে উঠেছে সুরেশ; অভিনয়ের দিন প্রত্যহ সামনের সিটে বসে থিয়েটার দেখে, রিহার্স্যালেও যাতে ভেতরে যেতে পারে তার জন্য মালিককে দশ-হাজার টাকা ধার দিয়েছে। এইবার শুরু হয়েছে তার বাড়ীতে যাতায়াত। মুক্তোর মালা, গ্রামোফোন, আলমারী আরও সব কত কি কিনে দিয়েছে সুরেশ, তার একটা বিস্তৃত বিবরণও সংগ্রহ করেছে চারুবালা।

ব্রজরাণীর গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠ্‌ল শুনে। সে ঠিক বিশ্বাসও করতে পারলে না।

সেদিন রাত্রে সুরেশ ওর কাছে আসতেই ব্রজরাণী সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁগো একি সত্যি ? ঠিক ক'রে বলো—আমাকে লুকিও না।'

'তুমি কি পাগল ? ক্ষেপেছ ? আবার এই বুড়ো বয়সে ? সময় কোথা ?'

'ঠিক বলছ ?'

'ঠিক বলছি।'

'আমার দিব্যি ?'

'তোমার দিব্যি।'

ব্রজরাণী নিশ্চিন্ত হ'ল। চারুটার যেমন মাথা খারাপ। ঘর-পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। ওর কেবলই স্বামীকে সন্দেহ।

পরের দিন চারুবালা দুপুরে বেড়াতে এল। ব্রজরাণীর মুখে সব কথা শুনে সে একটু হাসল। ম্লান, শুষ্ক হাসি। বললে, 'ও এত ছোট হয়ে গেছে ? তোর দিব্যি ক'রে মিছে কথা বললে ?'

'যাঃ, তাই কখনও পারে ? তোর বড্ড অবিশ্বাস চারি।'

চারুবালা সেদিন আর কিছু বললে না। দিন-দুই পরে অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যেবেলা গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হ'ল, 'চল্, থিয়েটার দেখতে যাই।'

'সে কিরে ? একা একা ?'

'তাতে কি হয়েছে, মেয়েদের সীটে বসব'খন। খুব ভাল বই আছে। টিকিটও কাটিয়ে রেখেছি আগে, এই ভ্যাখ্‌!'

ব্রজরাণী তৈরী হয়ে নিলে। সত্যিই ভাল নাটক, অভিনয়ও জমেছে খুব। ব্রজরাণী তন্ময় হয়ে দেখছে এমন সময় হঠাৎ চারুবালা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'ঐ যে মেয়েটা হেলেন সেজেছে ওরই নাম সরোজিনী, আর ঐ ভ্যাখ্ চেয়ে—তোর কর্তা, সামনের সিটে বসে একদৃষ্টে গিলছেন হেলেনকে!'

বিছের কামড়ের তীব্র যন্ত্রণার মত একটা অভূতপূর্ব এবং অব্যক্ত যন্ত্রণায় ব্রজরাণী যেন শিউরে, বেঁকে, কুঁকড়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। কিন্তু তারপরই আবার অভিনয় দেখতে লাগল ; একমনে না হোক্, একদৃষ্টে।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়তে সুরেশ উঠে ভেতরে চলে গেল। আবার অভিনয় শুরুর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে বসল।

চারুবালা বললে, 'চল্, বাড়ী যাই এবার!'

'পাগল!' বেশ নিশ্চিন্ত ও সহজ কণ্ঠেই ব্রজরাণী উত্তর দেয়, 'এমন বই, শেষ পর্যন্ত না দেখে উঠি কখনও?'

সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নিবিষ্ট চিত্তে দেখতে লাগল। এমন কি ড্রপ পড়বার সময়ও মুখ তুলল না।

এমনই দুর্দৈব, সেদিনই সুরেশ এল ওর কাছে। তখন প্রায় রাত একটা। ক্লান্ত, অবসন্ন। ব্রজরাণী সযত্নে ওর সেবা করল, যেমন প্রত্যহ করে। তারপর খুব স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করল, 'এত রাত পর্যন্ত কি করলে? মিছিমিছি শরীর খারাপ।'

সুরেশ উত্তর দিলে, 'আজ তুলোর বাজারটা ভারি গোলমেলে গেছে। তেমনি বোম্বাইয়ের দরটা পেতেও দেরি—টেলিফোন ছেড়ে উঠতে পারি নি। তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর তবে বোম্বাইয়ের লাইন পাওয়া গেল।'

ব্রজরাণী তেমনি শান্ত নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধু বললে, 'তুমি না আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করলে সেদিন? সামান্য কারণে এত মিছে বলো? ছিঃ! আমাকে বললে না কেন, আমি কি ঝগড়া করতুম তোমার সঙ্গে?'

সুরেশ আর প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারল না, আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল।

ঝগড়া সত্যই ব্রজরাণী করল না। তার বদলে লোক ডেকে ওর খাট, বিছানা, আলমারী, চেয়ার, ঘড়ি—মায় বাসন কোসন পর্যন্ত বিক্রি ক'রে ফেললে। বাড়ীর একটা ভাড়াটেও জুটে গেল! ওরই বাড়ীর নিচে সেকরার দোকান ছিল, লোকটি বিশ্বাসী—তার হাতেই বাড়ী ভাড়া আদায় ও টেক্স-খাজনা, মেরামত ইত্যাদির ভার দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাভরণ অবস্থায় বিধবার বেশে যাত্রা করল একেবারে

বৃন্দাবন। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে কেউ ভাল ক'রে বুঝতেই পারলে না—ব্যাপারটা কী হ'ল। সাতদিনের মধ্যে সব শেষ। চারুবালা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল, আরও পাঁচটা বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না। কিন্তু কারুর কথাই ব্রজরাণী শুনল না। নিজের কোমরের বিছাটা চারুবালাকে দিলে, মুক্তো বসানো চুড়িগুলো দিয়ে গেল ওর ছেলের বৌয়ের উদ্দেশে। ঝি-চাকরদের বকশিশ ক'রে, এখানকার সমস্ত সম্পর্ক শেষ ক'রে দিয়ে গেল।

চারুবালা ছলোছলো চোখে প্রশ্ন করল, 'আবার কবে দেখা হবে?'

'কী জানি' হাসি মুখে বললে ব্রজরাণী, 'তবে দেখা আর না হওয়াই তো ভাল।'

বৃন্দাবনে ওর গুরুদেব ছিলেন। তিনি কাছাকাছি একটি মন্দিরে ঘর ভাড়া ক'রে দিলেন, আর একটি মন্দির থেকে 'পায়স' বা প্রসাদ পাবারও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। ব্রজরাণী একমনে কিনা জানি না, নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবৎসেবায় মন দিল।

কিন্তু ক্রমশ সেটা নেশার মত পেয়ে বসল ওকে। দান-ধ্যান, ব্রত-উপবাসে ওর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। গুরুদেবকে সঙ্গে নিয়ে ও সব বড় বড় তীর্থ ঘুরে এল। নগদ টাকা তারপরও প্রচুর ছিল—সেগুলো সাধন ভজনের অন্তরায় হবে মনে ক'রে, এখানে ওখানে মন্দিরে, ঠাকুর-সেবায়, রামকৃষ্ণ মিশনে, সব বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হ'ল। এখন শুধু মাসোহারার উপর ভরসা, তাও নিজের প্রাণধারণের খরচা ছাড়া কিছুই রাখত না কাছে। প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করে, সকাল সন্ধ্যায় সমস্ত বড় বড় মন্দিরে ঘোরে। হেঁটে 'বন-পরিক্রমা' ক'রে এল। বর্ষায় জলে ভেজে, গ্রীষ্মে রোদে পোড়ে। কিছুতেই ক্লান্তি নেই, দুঃখ বোধ নেই, অন্তরের আনন্দে সর্বদাই যেন মশগুল। হয় নাম জপ করে, নয়ত গুন্ গুন্ ক'রে কীর্তন গায়, মুখে সর্বদা প্রসন্ন হাসি—চোখের দৃষ্টি নির্মল। ওর অন্তর যেন ধোয়া-মোছা পরিষ্কার

হয়ে গেছে। সেখানে কোনও মালিন্য নেই, নেই কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

এমনি ক'রে যত দিন যায় তত ওর কৃচ্ছ্রসাধন বেড়ে ওঠে। অন্তরের আকুলতা তত বাড়ে। রাস্তায় ছেলেরা হয়ত এক পয়সা দামের পট সাজিয়ে পূজো-পূজো খেলা করছে, ব্রজরাণী সেইখানেই রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে। কেউ কোথাও 'রাধে' বলে উঠলে ও চম্‌কে ওঠে। আরতির বাদ্য কানে এলে চোখে জল ভরে আসে। মনে হ'ল যে এতদিনে ব্রজরাণী ঈশ্বরে-সমর্পিত-চিত্ত হতে পেরেছে। ওর মন থেকে সমস্ত কিছু পার্থিব জিনিসই মুছে গেছে। আজকাল ওর তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছাও আর নেই—ব্রজের রস যে পেয়েছে তার আর অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন কি? একমুঠো প্রসাদ, একখানা কেটে কাপড় পরণে এবং দর্শন ও জপ—এছাড়া বৃন্দাবনের বাইরের সমস্ত জগৎ ওর কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু তবু এই আকুলতার মধ্যে ওর নিজের যেন কোথায় একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। যত সেটা বোধ করে, যত মনের মধ্যে নিষ্ঠার একটা সূক্ষ্ম অভাব টের পায়, তত ওর আকুলতাও বাড়ে। যার কাছে যতটুকু উপদেশ পায় সেইটুকুকেই আঁকড়ে ধরে আর চোখের জলে ভাসতে ভাসতে রাধারাণীর কাছে মাথা খোঁড়ে, 'মনকে শান্ত করো, তোমার পায়ে নিয়ে যাও একান্ত ক'রে—আর কিছু চাই না!'

ব্রজরাণী পৃথিবীকে ভুললেও পৃথিবী যে এখনও ব্রজরাণীকে ভোলে নি সেটা একদিন বোঝা গেল। হঠাৎ একখানা চিঠি এল ওর নামে—প্রথমটা খুলবে না ভেবেছিল, তারপর কি মনে হ'ল, কৌতূহল ও বেদনার একটা যুক্ত পীড়নে খামখানা না খুলে পারল না সে। চিঠিটা সুরেশবাবুরই লেখা। দীর্ঘ ইতিহাস, তার সঙ্গে অসংখ্য মিনতি।

সরোজিনীকে উপলক্ষ্য ক'রে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অনেকদিনই ঢিল দিয়েছিলেন সুরেশবাবু—তার ফলে একদিন তাঁকে আবিষ্কার করতে হ'ল যে তিনি বহু টাকা লোকসান দিয়ে প্রায় পথের ভিখারী হয়েছেন। এর ভেতর তাঁর সঙ্গে সামান্য কী একটা ঝগড়া উপলক্ষ্য ক'রে সরোজিনী আত্মহত্যা করায় পুলিশে তাঁকে সন্দেহ ক'রে জেরবার করে! বিস্তর দেনা ক'রে সে দায় থেকে যদি বা অব্যাহতি পেলেন, নিজে অকস্মাৎ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন। প্রথম প্রথম চিকিৎসা করলে হয়ত ভাল হ'ত কিন্তু সে রকম অর্থ ছিল না। সে হ'লও প্রায় মাস-নয়েকের কথা। ইতিমধ্যে তার অপরাধের সবচেয়ে চরম শাস্তিই ভগবান দিয়েছেন—চারুবালাকে কেড়ে নিয়ে। সে আর নেই, হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে মারা গেছে। ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট, বড়টি সবে ফার্স্ট ক্লাসে পড়ছে—কে যে তাদের মুখে জল দেয়, কে-ই বা তার সেবা করে, তার ঠিক নেই! তার চেয়ে বড় কথা, তারা খাবে কি? তাঁর বাড়ীখানিও নেই, একটা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করছেন বছরখানেক ধরে। এখন একমাত্র আশা ব্রজরাণী যদি তাঁকে ক্ষমা করে। তাঁর আর মুখ নেই অবশ্য সে ক্ষমা চাইবার। কিন্তু তবু—

চিঠিখানা বার দুই পড়তে হ'ল ব্রজরাণীকে। বহু বৎসরের বহু ইতিহাস এসেছে ঐ ক'ছত্রের মধ্য দিয়ে—সবটা ধারণা করতে দেরি হয় বৈকি!

তারপর বহুক্ষণ বসে রইল ও—নিস্তব্ধ নিস্পন্দ হয়ে।

এ কী করলে রাধারাণী, এ কী করলে? এ তোমার কী পরীক্ষা?

কিন্তু বহুক্ষণ বসে থাকবার পর আজ এতদিন পরে, একটা সত্য ওর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল; এতদিন ও আত্মপ্রবঞ্চনাই করেছে। শুধু তাই নয়, ওর ঠাকুরকেও ও ঠকিয়েছে। গোবিন্দকে ভালবেসে ও ঘর ছেড়ে এখানে আসে নি, এসেছিল প্রেমিকের ওপর অভিমান ক'রে। ওর সমস্ত পূজা অর্চনা জপের মধ্যেও সে অভিমান একেবারে

মুছে যায় নি, আজও সে বেদনা-বোধ আছে। সে সম্বন্ধে কৌতূহল আছে। ও বিশ্বাস করতে চেষ্টা করেছিল যে ও ঈশ্বরকেই ভালবেসেছে—কিন্তু এখন বুঝতে পারছে যে এই সমস্ত সময়টাই শুধু অভিনয় করেছে ভালবাসার। অন্তরের প্রেম ওর মানুষকে ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি, এমন কি মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমও কখনও কখনও দেহাতীত স্তরে ওঠে, সে স্তরেও ব্রজরাণী পৌঁছতে পারে নি। আর তা পারে নি বলেই প্রেমের দেবী রাধারাণী, তার ব্রজেশ্বরী, তাকে ক্ষমা করেন নি। তার সমস্ত সাধনার প্রাসাদকে এমন নিষ্ঠুর আঘাতে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছেন।

সমস্ত রাত এবং সমস্ত দিন অভুক্ত ও বিনিদ্র বসে থাকবার পর ব্রজরাণী মনস্থির করল। মানুষকে ভালবাসাও অপরাধ নয়, অন্তত রাধারাণী সে অপরাধ নেবেন না। সে কলকাতাতেই ফিরে যাবে।

কলকাতাতে এসে ব্রজরাণীকে চারুবালার সংসারের সব ভার তুলে নিতে হ'ল। সুরেশের সেবা, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো, সব। প্রতিদিন লক্ষ জপ আর সম্ভব হয় না—অতক্ষণ ধরে পূজা তো নয়ই। কিন্তু সে সম্বন্ধে ওর কোন ক্ষোভ নেই, কোন নালিশ নেই। প্রসন্ন চিত্তেই সে সংসারের প্রতিদিনকার খুঁটিনাটি কাজ করে যায়, সময় নষ্ট হচ্ছে বলে বিলাপ করে না। সুরেশবাবু একেবারেই পঙ্গু হয়ে পড়েছেন, ব্রজরাণী সস্নেহে এবং সযত্নে তাঁর সর্বপ্রকার সেবা করে, তার জন্যও কোন অনুযোগ নেই ওর।

শুধু একটা কথা ব্রজরাণী শুনল না—ওর বৈধব্যের বেশ কিছুতে ছাড়তে রাজী হ'ল না। চুল ছাঁটা ছোট ছোট ক'রে, মোটা কেটে কাপড় পরনে, আভরণের মধ্যে গলায় তুলসীর মালা। নিবিড় বৈরাগ্য ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে। সুরেশবাবু পূর্ব সম্পর্কের জের টানতে চান, পারেন

না। ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'তোমার দিকে চাইতে পারি না যে রাণী! এ তোমার কি দশা আমি করলুম!'

ব্রজরাণী হেসে জবাব দেয়, 'আমার দিকে চাইবার দরকার কি। নিজের দিকে চাও, পরকালের কথা ভাবো। বেশী দেরি নেই আর।'

সত্যই আর দেরি ছিল না। স্থুরেশবাবু মারা গেলেন বছর কয়েকের মধ্যেই।

কিন্তু ব্রজরাণী এদের ছাড়তে পারল না। ওরই বাড়ী-ভাড়ার আয় ভরসা! তার মধ্যে লেখাপড়ার খরচ, মেয়ের বিয়ে দেওয়া। স্থুতরাং রাঁধুনি তো দূরের কথা, ঝি রাখাও সম্ভব হয় না। ঘর মোছা, বাসন মাজা, জল তোলার মধ্য দিয়েই দিনরাত কাটে। শুধু কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওর ঠোঁট নড়ে, হয়ত বা জপ করে, রান্না করতে করতে গুন্ গুন্ করে কীর্তনের পদ। সেইটুকু মাত্র ওর চিহ্ন আছে পূর্ব জীবনের।

বড় ছেলে প্রবীর বি-এ পাশ ক'রে চাকরীতে ঢুকল। মেয়ের বিয়ে দেওয়া হ'ল। ব্রজরাণী নিজের পরিচয় দিলেন পুরোনো ঝি ব'লে। এইবার প্রবীরের পালা। প্রবীরেরও বিয়ে হয়ে গেল একদিন

বিয়ের দিনচারেক পরে প্রবীর ওকে ডেকে বললে, 'নতুন মা, আমার শ্বশুরবাড়ীতে কী সব কানাকানি হয়েছে বিশ্রী রকমের,—কে এসব কথা ওদের কানে তুললে বল তো!'

ব্রজরাণী যেন দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে চম্‌কে উঠল। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত-কণ্ঠে শুধু বললে, 'তাহলে এইবার বিদায় দে বাবা!'

একটু ইতস্তত ক'রে প্রবীর বললে, 'আমার তো ঐ সামান্য আয় নতুন মা, তোমায় বিদায় দিয়ে সংসার চলবে কী ক'রে?'

ব্রজরাণী হেসে বললে, 'পাগল ছেলে! ও বাড়ী কি আমি নিয়ে

যাব রে! ও তোদেরই রইল, বরং একটা লেখাপড়া ক'রে নে এইবেলা—'

'বাড়ী রেখে কি করবো বলো। তোমার তো সেখানের খরচা আছে। পনেরো বিশ টাকায় তো তোমার চলবে না। টেক্স-খাজনা দিয়ে থাকে তো গোটা আশি টাকা। তার মধ্যে মেরামতটাও ধরে রাখা উচিত। তা' থেকে তোমায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা দিলে কি আর থাকে বলো?'

ব্রজরাণী যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, 'সে-কি রে! তুই কি ভাবছিস্ তোর কাছ থেকে মাসহারা নেব? আমি ও থেকে এক পয়সাও চাই না, যা রইল তোদেরই সব। শুধু যাবার গাড়ী-ভাড়াটা দিস্।'

এইবার প্রবীর যেন একটু অপ্রতিভ হয়। বলে, 'তা হ'লে তোমার চলবে কিসে?'

'বৃন্দাবনে রাধারাণীর রাজত্ব—সেখানে খাবার ভাবনা নেই;··· তোরা তাড়াতাড়ি লিখিয়ে নে।'

প্রবীর করিৎকর্মা ছেলে, তার এসব ব্যাপারে দেরি হবার কথা নয়। সে য়্যাটর্ণীর বাড়ী গিয়ে লেখাপড়া পাকা ক'রে নেয়। ব্রজরাণী তাঁর বাড়ী নিঃসর্তে প্রবীর আর তার ছু'ভাইকে দান ক'রে যাচ্ছেন। তার বদলে আর কোন দাবীদাওয়া কিম্বা শর্ত রইল না।

দলিল পড়ে শোনান য়্যাটর্ণী, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান ব্রজরাণীর মুখের দিকে, যেন মনে হয় ওকে সতর্ক করতেই চান—ওর নির্বুদ্ধিতার জন্য। ব্রজরাণীর মুখের ভাব প্রশান্ত, সস্মিত। সে কলম ধরে পাতায় পাতায় সই করে, এতটুকু দ্বিধা কিংবা দুশ্চিন্তা দেখা যায় না। তারপর প্রবীরের দিকে তাকিয়ে বলে 'আমাকে তাহ'লে কালই একটা টিকিট কেটে দে বাবা, দেরি করবো না।'

'কালই? বার্থ পাওয়া যাবে কি এত তাড়াতাড়ি?'

'না না, বার্থ নয়। বার্থ নয়। থার্ড ক্লাস টিকিট একটা কেটে মেয়ে-গাড়ীতে তুলে দিবি।'

গাড়ীতে তুলে দিয়েও প্রবীর একটু ইতস্তত করে, বলে, 'সঙ্গে কত দেব, নতুন মা।'

একগোছা নোট পকেট থেকে বার করে সে। পঞ্চাশ, ষাট কিংবা আরও বেশী।

মাথা নেড়ে ব্রজরাণী বলে, 'দুটো খুচরো টাকা দে,—থাকে তো, অত টাকায় দরকার নেই!'

প্রবীর বাড়ী ফিরে এসে ভাইকে বলে, 'নতুন মা সেখানেও এতদিনে বোধ হয় বেশ কিছু জমিয়েছেন, হয়ত বাড়ী-টাড়ীও কিনে থাকবেন।'

ভাই সমীর বলে, 'তুমি কি তাহ'লে ওঁকে কিছু পাঠাবে না?'

'দরকার কি? উনি তো বারণ ক'রেই গেলেন।'

বিষয়ের সমস্ত বন্ধন খসিয়ে, সম্পর্কের সমস্ত দাবী মিটিয়ে ব্রজরাণী আবার ব্রজে ফিরে এসেছেন, নিঃস্ব, কপর্দক-শূন্য হয়ে। আজ তাঁর কোথাও কিছু আর নেই, পরনের কাপড়খানা ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র পর্যন্ত না।

বয়স হয়েছে, জরা তাঁর লঘু চঞ্চল গতিকে করেছে বিড়ম্বিত—কিন্তু তবু আজ ব্রজরাণী আশ্চর্য হালকা বোধ করেন নিজেকে। কে বলেছে বয়স হয়েছে তাঁর? কে বলেছে তাঁর যৌবন আর নেই? এই তো সবে শুরু। এই প্রথম তিনি অনন্যমনা হয়ে চলেছেন অভিসার-যাত্রায়—তাঁর গোবিন্দের উদ্দেশে।

আবার তাই এতকাল পরে আজ যেন মনে হয় কণ্ঠে তাঁর সঙ্গীত উঠেছে গুন-গুনিয়ে, পায়ে পায়ে বেজে উঠেছে নৃত্যের ছন্দ। নিজের দিকে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। জরা, অবসাদ, ক্লান্তি আজ

আর কোথাও কিছু নেই। উনিশ বছরের তরুণী মেয়ে যেন চলেছে অভিসারে, আনন্দের অভিসারে। তার যৌবনের দীপ্তিতে চোখ ঝল্‌সে যায়, বিস্ময় জাগে মনে মনে।

কোথাও কিছু নেই তাঁর, মাথার ওপর আশ্রয় নেই, আহারের সংস্থান নেই। নেই গায়ে একটা শীতবস্ত্র। তাই বৃন্দাবন আজ তার বুক পেতে দিয়েছে তাঁকে, মাধুকরী আজ ভাণ্ডার সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে, প্রকৃতি অঞ্চল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে।

এ কী মুক্তি, এ কী আনন্দ, এ কী উত্তেজনা!

ব্রজরাণী বুঝি নিজেকে দেখেই অবাক হয়ে যান। এ যেন তাঁর বিশ্বাস হয় না। বুঝি চিনতেও পারেন না এ'কে—আজ যে পাগলের মত নিজের আনন্দে মশ্‌গুল হয়ে ছুটে চলেছে।

তিনি তাঁর জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান নি এই দীর্ঘ জীবনে—হয়ত এ পাবে, এই নতুন ব্রজরাণী।

কলকাতার উপকণ্ঠে জায়গাটা—ঠিক শহরও নয়, আবার পাড়াগাঁও বলা চলে না। সেইজন্যে শহর আর পাড়াগাঁর অসুবিধাগুলো সমস্তই আছে—সুবিধা নেই একটাও।

এরই একটা অংশে ছোট্ট একটা চালাঘরে বাবাঠাকুরের মন্দির। কেউ বলে পঞ্চানন্দ, কেউ বলে বাবা পঞ্চানন—সাধারণ লোকে জানত বাবাঠাকুর! এককালে এঁর প্রতিপত্তি ছিল ঢের—শিবরাত্রি আর চড়কের সময় বিরাট হোগলার ম্যারাপ উঠ্‌ত ওর পাশের মাঠটায়, খুব ধূমধাম খাওয়া-দাওয়া চলত, রীতিমত মেলা বসে যেত। তখন কেউ ভাবে নি যে এ মাঠের জমি একদিন বিক্রি হয়ে যাবে—কারণ বছরের বাকী সময়টা কালকাসুন্দে আর বনডুমুরের জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত জমিটা, সে জঙ্গল বর্ষায় এমনই ঘন আর উন্নত হয়ে উঠ্‌ত যে মন্দিরটা পর্যন্ত লোক-চক্ষুর আড়ালে চলে যেত।

আজও অবশ্য তা আড়ালেই চলে গেছে কিন্তু তা জঙ্গলের জন্যে নয়, বিরাট বিরাট চারতলা পাঁচতলা বাড়ীতে ভর্তি হয়ে গেছে চারদিকের সমস্ত জমি। যেখানে যতটুকু জমি পাওয়া গেছে মানুষের লোলুপ দৃষ্টি তা গ্রাস করেছে, হয়ত ঐ সামান্য মন্দিরটা উঠিয়ে ফেলতে পারলেও খুশি হ'ত—নেহাৎ প্রাচীন শিবমন্দির বলেই সাহসে কুলোয় নি, তা ছাড়া দেবোত্তর একটা দলিলও বোধহয় আছে কোথাও।

আগে ঐ চালাঘর প্রতি বৎসর নতুন ক'রে ছাইয়ে দেবার লোকের অভাব হ'ত না। চারদিক থেকে নতুন খড় এসে পড়ত—ঘরামীরাও বিনা পয়সায় খেটে দিয়ে ধন্য হ'ত। এখন আর নতুন ক'রে ছাওয়া তো হয়ই না—বছর বছর বর্ষার আগে গোঁজা দেওয়াও অসম্ভব হয়ে

উঠেছে। ফলে বর্ষায় বাইরের থেকে ভেতরেই বোধহয় জল বেশি পড়ে। দেওয়ালও নোনা ধরে চুনবালি সব খসে গিয়ে কঙ্কাল-দশা প্রাপ্ত হয়েছে। তারই মধ্যে এব্ড়ো-খেবড়ো একটি পাথরের শিবলিঙ্গ জল ও ফুলের অভাবে শুকনো পড়ে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব গৌরবের আর কিছুই নেই—শুধু নামটি ছাড়া। চারদিকের সৌধ-শ্রেণীর মধ্য দিয়ে যে গলিটি একেবেঁকে চলে গিয়েছে আজও তার নাম আছে বাবাঠাকুরতলা লেন। কর্পোরেশনের মধ্যেই এটা—এই গলি থেকে বেরোলেই তিনটে রাস্তার বাস্ মেলে, পাঁচ মিনিট হেঁটে গেলেই ট্রাম।

এই বাবাঠাকুরের বর্তমান সেবাইত কে—কেউ তা জানে না। শোনা যায় এককালে বহু সম্পত্তিই ছিল মন্দিরের, সে লোকটি নানা কৌশলে তা বেচে খেয়েছে। তবে পূজার ব্যবস্থাটা একেবারে লোপ পায় নি—একটি পূজারী আছে মাইনে-করা। পারিশ্রমিক এবং বেলপাতা ও অর্ঘ্যের চাল বাবদ মাসে সে পায় মবলগ্ পাঁচ টাকা। এ-ছাড়া শিবরাত্রি এবং চড়কে একটি অধিকতর অভিজাত পূজারী আসে। সে দুদিনের যা আয় তার দশ আনা সেবাইতের, পাঁচ আনা সেই নতুন পূজারী ঠাকুরের এবং এক আনা নগেন-ঠাকুরের পাওনা। তবে নগেনঠাকুর সেইসব [illegible] [illegible] চাঁদা তোলে—বলা বাহুল্য তার এক পয়সাও জমা পড়ে না, তার ষোল আনাই ওঠে [illegible] ট্যাঁকে।

হ্যাঁ, নগেনঠাকুরকে আপনিও দেখেছেন বৈকি!

কালো, ঈষৎ বাঁকা ধরণের একহারা চেহারা। বহুদিনের নেশার ফলে চক্ষু কোটরগত, দৃষ্টি স্তিমিত। গোঁফ-দাড়ি কামানোর অভ্যাস আছে কিন্তু সে কুড়ি পঁচিশদিন অন্তর অন্তর। একটি মলিন থান পরনে, গায়ে একটি নামাবলী, তা সেটা খুলে গায়ে দেওয়া হয়ে ওঠে না প্রায়ই, গলায় আলতো জড়ানো থাকে। তার ফাঁক দিয়ে ময়লা পৈতেটা দেখা যায়—তিনভাঁজ হয়ে মালার মত গলায় ঝুলছে।

এস্টেটপত্র বলতে হাতে একটি পুরানো বার্লির কৌটো এবং ব্যাঙ্ক বলতে ট্যাঁক।

এছাড়া ওঁর কোথাও কিছু আছে বলে জানা নেই। বাসা কোথাও নেই, বাবাঠাকুরের মন্দিরের মধ্যেই রাত্রে শয়নের কাজটা চলে। গৌরীপট্টের পাশে যে অবশিষ্ট সঙ্কীর্ণ স্থানটি তাইতেই তিনি শুয়ে পড়েন। অবশ্য যেদিন শোবার ইচ্ছা হয়, নইলে অধিকাংশ দিনই নেশার ঘোরে চুপ ক'রে জেগে বসে থাকেন মন্দিরের সরু চাতালে আর খুব বেশী মশা কামড়ালে অনিচ্ছায় একবার হাত নেড়ে বিড়বিড় ক'রে বকেন। বর্ষায় যখন খুব জল পড়ে, তখন আশেপাশের যে কোন বাড়ীর রকে গিয়ে আশ্রয় নেন, পাড়ার ছাগল আর রাস্তার কুকুরদের মধ্যে। কনস্টেবলরা চিনে গেছে, তারাও আর বিরক্ত করে না। সাপ-খোপ বিছের ভয় নেই ওঁর, ময়লা তো চোখেই পড়ে না—পাড়ার একটি বুড়ী ঝি পাঁচ-সাত দিন অন্তর মন্দিরের মধ্যেটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে—নইলে নগেনঠাকুরের কিছুতেই আপত্তি নেই।

ঠাকুরমশাই প্রায়ই আসেন এ-পাড়ায়, কিছু 'সাহায্য' চাইতে। কেউ খুব ধীরে ধীরে খুট-খুট ক'রে কড়া নাড়ছে শুনলেই আপনি বুঝবেন নগেনঠাকুর। তারপর যদি দোর খোলেন কিংবা জানলা দিয়ে উঁকি মারেন তো দেখবেন সেই অপরূপ মূর্তিটি বিনীতভাবে ঘাড়টি বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আপনাকে দেখা মাত্র সে মূর্তি অন্যদিকে চেয়ে খুব চুপি চুপি নৈর্ব্যক্তিক ভাবে কেমন একরকম গড়গড় ক'রে কথা বলতে শুরু করবেন, ভাল ক'রে না শুনলে বোঝাই যাবে না—'আজ্ঞে, বাবাঠাকুরের ওখান থেকে আমি আসছি। জানেনেই তো বাবার মন্দিরের অবস্থা, একটু কিছু যদি সাহায্য করেন বাবার পূজার জন্যে।' আজকাল পুরানো লোকরা প্রায়ই কিছু দেয় না—একেবারে যারা নতুন এসেছে এ-পাড়ায়, তারা হয়ত কিছু দেয় দু-আনা, এক আনা—বড় জোর একটি সিকি।

সে যাই হোক, কোনমতে আনা-বারো হলেই আর নগেনঠাকুর এ-মেহনৎও করেন না। সোজা চলে যান ওখান থেকে আবগারীর দোকান। খানিকটা আফিং সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এবার যান নিভৃতে রেল লাইনের ধারে একটি ছোট খেজুর-গাছতলায়। যদি সেখানে কোনদিন গিয়ে পড়েন তো আজও দেখতে পাবেন খান-দুই পোড়া ইট পাতা আছে, তার মধ্যে আগুন জ্বালার চিহ্ন। কোথাও থেকে পুরোনো মাখন বা জেলির কৌটো সংগ্রহ ক'রে ধুয়ে নিয়ে লতা-পাতা জ্বেলে চাপিয়ে দেন সেটা। তারপর কচি কচি খেজুর কিংবা পেয়ারা পাতা সংগ্রহ করে আফিং গুলে কি একটা তৈরী করতে বসেন—কেউ কেউ বলে গুলির ছিটে !

ভোজনের ব্যবস্থা একটা আছে। অনেকটা পাকাপাকি রকমই। সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গলে মুখে জল না দিয়েই নগেনঠাকুর বেরিয়ে যান বাজারে। যেদিন মনে থাকে সেদিন মন্দিরের ভেতরে পেরেকে টাঙানো ভাঙ্গা ধামাটা বার ক'রে নেন—নইলে নামাবলীটাতেই কাজ চলে। মন্দিরের দুদিকে দুটো বাজার আছে কাছাকাছির মধ্যেই। দুটি বাজারেই ওঁর অপক্ষপাত সমদৃষ্টি নিয়ে আনাজ-ওয়ালাদের কাছে ধামাটি পেতে দাঁড়ান। কোন নতুন লোক হ'লে একবার, যেন খুব অনিচ্ছায় বিড়বিড় ক'রে বলেন, 'বাবাঠাকুরের তোলা !' কেউ বিনা প্রতিবাদে দেয়, কেউ বা একটু গজগজ করে— 'বাবা, আর পারিনে তোলা দিয়ে দিয়ে ! একবার জমিদারের তোলা, একবার তার সরকারের তোলা, আবার বাবাঠাকুরের তোলা। আমাদের কারবার ক'রে আর লাভ কি ? সব বিলিয়ে দিয়ে চলে গেলেই হয় !' বলে কিন্তু দেয় ঠিক, কেউ একটা ঝিঙ্গে, কেউ একটা ঢ্যাড়স, কেউ বা দুটো উচ্ছে। একটা বাজার শেষ হ'লে মন্দিরের কাছে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার আছে, তাদের গিয়ে দিয়ে আসেন। এদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হচ্ছে একবেলা খেতে দেবে ওঁকে, যখন হোক্। তারপর আর এক বাজারের তোলা তুলে এনে সটান গিয়ে ওঠেন

কালীচরণের ময়রার দোকানে। তাদের দশ বারোটি কর্মচারীর জন্য রাঁধতেই হয়—সেই বাজার খরচা অনেকটা বেঁচে যায় ওঁর তোলা-আনাজে। তার বদলে ওরা ওঁকে দেয় বাসি রাবড়ির ঝোল দেওয়া বড় এক গেলাস চা এবং খানিকটা মিষ্টি। সে মিষ্টিরও এক ইতিহাস আছে। সারাদিন ধরে রসগোল্লা, সন্দেশ, পান্তুয়া বেচতে বেচতে কিছু কিছু ভেঙে নষ্ট হয়। সেইগুলো একটি ভাঁড়ে জমানো থাকে। অবশ্য তার খদ্দেরও আছে দু-চারজন। দু-পয়সা চার পয়সায় যারা অনেকখানি চায় (বেশীর ভাগই আফিংখোর) তারা ঐ বস্তুটির সন্ধান রাখে। কিন্তু তবু বাঁচে ঢের, সেই সবটাই সকালবেলা নগেনঠাকুরের পাওনা হয়। এইটিই তাঁর দিনরাতের প্রধান খাদ্য—ভাত খাওয়াটা হয় খেয়ালমত, মনে পড়লে—কোনদিন বেলা তিনটেয়, কোনদিন সন্ধ্যা ছটায়। সকালের ভাতই তারা বেড়ে তুলে রাখে, রাত নটায় খেতে এলেও সেই শুকনো ঠাণ্ডা ভাত এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া ডাল তরকারী খেতে হয়।

নগেনঠাকুরের বাড়ী কোথায় তা কেউ জানে না। কোন আত্মীয়-স্বজন আছে কিনা তাও জানা নেই। কোথা থেকে কেমন ক'রে এসে জুটলেন—আজ সবাই তা ভুলে গেছে। এক কথায় ওঁর কোন পূর্ব ইতিহাসই জানা যায় না। শুধু একদিন দৈবাৎ যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল সেটা যেমন বিস্ময়কর—তেমনি বিচিত্র। ওঁর রহস্যময় ইতিহাসকে আরও জটিল ক'রে দিয়েছিল ব্যাপারটা। ঘটনাটা এই :—

বেলা দশটার সময় চা খেয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বসে রোদ পোয়াচ্ছেন নগেনঠাকুর—গুটিকতক পরীক্ষার্থী ছাত্র ট্রেণের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আগের দিনের সংস্কৃত পরীক্ষার একটি প্রশ্ন নিয়ে দারুণ তর্ক

বাধিয়েছে। কেউ বলছে ওটা এই, কেউ বলছে তা হ'তে পারে না। আপন মনেই বসে ঝিমোচ্ছিলেন নগেনঠাকুর, হঠাৎ এক সময় ঘাড় তুলে অতিকষ্টে চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা ক'রে বললেন, 'য়ঁ্যা, কী বললে বাবারা? কোনটাই ঠিক হ'ল না যে। ওটা সপ্তমী বিভক্তি হবে!'

সকলে তর্ক থামিয়ে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল। তারপর দু-চারজন পাগলের প্রলাপ ভেবে একটু হেসেও উঠল। কেবল একটি ছেলে প্রশ্ন করল, 'সপ্তমী হবে কেন?'

মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে পাণিনির শ্লোক উদ্ধার ক'রে নগেনঠাকুর বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।

নিজে বলে নিজেই যেন অবাক। খানিকটা ওদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থেকে খুশী হয়ে হেসে উঠলেন আপনমনেই, 'আছে আছে বাবারা—এখনও মনে আছে।'

ছেলেগুলি স্তম্ভিত। অতিকষ্টে একজন নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'তাইত! ওটা তো মনেই পড়ে নি-রে। হেড-পণ্ডিত একদিন বলে দিয়েছিলেন ক্লাসে—মনে আছে?'

আর একটি ছেলে প্রশ্ন করলে, 'আ······তুমি লেখাপড়া জানো নাকি ঠাকুর?'

এবার ভাল ক'রে চাইলেন ঠাকুর, একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতেই বললেন, 'লেখাপড়া? না—এখন আর কিছুই জানি না। তবে এক সময় কাব্য-ব্যাকরণ পাস করেছিলুম। বি-এতেও সংস্কৃত ছিল, অনার্স পেয়েছি!'

বলে ফেলে যেন নিজেই অপ্রস্তুত হলেন। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে কথাটা এমনই বেমানান শোনাল যে সেটা—এমন কি ওঁর কাছেও ধরা পড়ল।

ছেলেরা কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠেছে তখন, সবাই মিলে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, 'তারপর ঠাকুর?'

'তারপর ? দিন কতক মাস্টারীও করেছি। তারও পর বিয়ে করলুম।'

'তারপর ?'

'তারপর—এই ! আর কি !' এক রকম ওদের ঠেলেই ঠাকুর চলে গেলেন প্ল্যাটফর্মের বাইরে। ইতিমধ্যে ট্রেণ এসে পড়ায় ছেলেরাও আর তাড়া করবার সুবিধা পেলে না।

কথাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কেহই পুরোটা বিশ্বাস করলে না। তবে কিছুটা যে সংস্কৃত জানেন ঠাকুর, এটা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ায় অনেকেই তারপর থেকে একটু যেন বেশী অনুকম্পার চোখে দেখতে লাগল ওঁকে। পুরুতগিরিও করতে পারে না—আশ্চর্য ! লেখাপড়া শিখে ভিক্ষে করে !

সেবার ভাদ্রের শেষের দিকে হঠাৎ নগেনঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কী অসুখ তা কেউ জানে না—কারণ খবরও কেউ পায় নি। নগেনঠাকুর নিজেও বোঝেন নি—শুধু এইটুকু বুঝেছিলেন যে, আর উঠতে পারছেন না কিছুতেই—বুকের মধ্যে কেমন করছে, তার সঙ্গে মাথায় যন্ত্রণা—মাথা তুলতে পারছেন না। শুয়েছিলেন মন্দিরের মধ্যেই, প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লেও এটা হুঁশ ছিল যে মন্দিরে পড়ে থাকা ঠিক নয়—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে বাইরের চাতালে পড়েছিলেন—। আর কোন কিছু খেয়াল ছিল না তাঁর।

খেয়াল যখন হ'ল তখন দেখলেন কে যেন তাঁর মাথা কোলে ক'রে বসে বাতাস করছে। আর একটু চেষ্টা ক'রে চোখ মেলে দেখলেন তুলসীর মা।

নগেনঠাকুর নিজে খুবই নীচে নেমেছেন—ঘৃণা, লজ্জা, ভয় প্রায় কোনটাই আর নেই—তবু তুলসীর মার কোলে মাথাটা আছে মনে

করতে আজও যেন কেমন ক'রে উঠল মনটা। তাড়াতাড়ি মাথাটা তুলে নিতে গেলেন।

'থাক্ থাক্ ঠাকুরমশাই। বড্ড দুব্বল, উঠতে পারবে নি। আর একটু থাকো।······কদ্দিন য়্যামন হয়েছে—য়্যাঁ, ঠাকুরমশাই? আমি তো কাল আত্ থেকে এমনি তোমাকে নে বসে আছি। বিকেল থেকেই দেখ্তিছি, তা আমি বলি বুঝি ঠাকুর নেশাভাঙ ক'রে ঘুমোচ্ছে। আত্তিরবেলাও অমনি পড়ে আছ দেখে সন্দ হ'ল—গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা যেন পুড়তে নেগেছে—কী তাত্!'

ঠাকুর অবস্থাটা মনে মনে ভেবে নেবার চেষ্টা করেন।

তুলসীর মা!! তিনি যে তিনি—তিনিও এ জীবটিকে ঘৃণা ক'রে এসেছেন এতকাল।

এককালে এই মন্দিরের কাছেই বস্তিতে একটা ঘর ভাড়া ক'রে থাকত তুলসীর মা। বৃত্তির মধ্যে ঝি-গিরিটা ওর গৌণ—বেশ্যা-বৃত্তিটাই মুখ্য। সে বিষয়ে ওর উদারতারও শেষ নেই। পয়সা যে সবসময় পায় তাও নয়—ওটা নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন বস্তি ভেঙ্গে গেছে—থাকবার একটা বাসাও খুঁজে নিতে পারে নি। সামান্য কিছু জিনিস-পত্র যা আছে অন্য ঝিয়ের কাছে রেখে দেয়, নিজে অধিকাংশ দিনই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে কাটায়। খুব বর্ষা নামলে অম্লানবদনে ফিমেল ওয়েটিংরুমে ঢুকে বেঞ্চিটায় শুয়ে পড়ে—অজস্র আবর্জনা এবং দুর্গন্ধের মধ্যে। ওরই জন্য নিশীথ রাত্রে নিম্ন শ্রেণীর মদ্যপদের আনাগোনা চলে প্ল্যাটফর্মে এবং কখনও কখনও ওকে নিয়েই নোংরা কলহেরও সৃষ্টি হয়।

কিন্তু নগেনঠাকুরের ঘৃণা ঠিক এ-জন্যও নয়। আর একটি বীভৎস দিক আছে ওর চরিত্রের। ওর ছেলে-পুলে হয় প্রায়ই। বৎসর-খানেক ধরে তাদের মানুষও করে চেয়ে-চিন্তে, ভিক্ষা ক'রে। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে বেচে আসে ভিখিরীদের কাছে। কলকাতায় মেছোবাজারের কাছে কোথায় ভিখিরীদের বড় আড্ডা আছে—

সেখানে ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে গেলেই তারা কিনে নেয়—পাঁচ, ছয়—কখনও কখনও দরদস্তুর করলে কিছু বেশীও পাওয়া যায়। যেদিনই যায় একটু সন্ধ্যের ঝোঁকে, ঐ টাকায় আসবার সময় এক বোতল মদ আর কিছু ঝাল ফুলুরি কিনে এনে লাইনের ধারে কোন ঝোপের মধ্যে বসে সারারাত ধরে একা একা সেই মদ খায়—বোধ করি সন্তানের শোক ভোলবার জন্যই। তার পরের দিন ভোরে উঠে একটা ডুব দিয়ে এসে আবার প্রকৃতিস্থ, যে-কে সে-ই! প্রতিবারই এই এক ইতিহাস। কথাটা খুব গোপনও নেই। এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই জানে।

নগেনঠাকুর ওর এই নির্মমতাটা, কোন বিচিত্র কারণে, কখনও সহ্য করতে পারেন নি। একবার খুব বলেওছিলেন ওকে, তুলসীর মা হেসে জবাব দিয়েছিল, 'কী হবে গা ছেলেমেয়ে ঠাকুরমশাই? মেয়ে বড় হয়ে তো এই কাজ করবে—আমি যা করছি? আর ছেলে বড় হয়ে চোরছ্যাঁচড় হবে, নয়ত ভিখিরী—মানুষ করতে তো পারব না, তার কথাও নেই। লাভের মধ্যে বড় হয়ে নেশার পয়সা না পেলে মাকে ধরেই ঠ্যাঙ্গাবে। তার চেয়ে চোখের আড়ালে যা খুশী হোক্ গে!'

এই তুলসীর মা!

নগেনঠাকুর অর্ধচৈতন্যের মধ্যেই একবার শিউরে উঠলেন। সস্নেহে মুখ নিচু ক'রে তুলসীর মা বললে, 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে—য়্যাঁ, ঠাকুরমশাই? চলো বরঞ্চ না হয় একখানা ইক্কাগাড়ী ক'রে তোমাকে ডাক্তারখানায় নে যাই—হেঁটে তো যেতে পারবে নি।'

নগেনঠাকুর ঘাড় নাড়লেন।

'কেন গা ঠাকুর? পয়সা নেই তাই? আমার কাছে আজ একটা টাকা আছে। ইক্কাগাড়ীর ভাড়া আমি দোব, তুমি চলো—'

অতিকষ্টে নগেনঠাকুর বললেন, 'আমি এখন উঠতে পাচ্ছি না তুলসীর মা—তুই যা!'

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে তুলসীর মা বললে, 'ঠাকুর, একটু চা এনে দোব খাবে?'

'না। তুই যা তুলসীর মা—দিক করিস্ নি!'

তুলসীর মার মুখ এক মুহূর্তের জন্য ম্লান হয়ে গেল। তারপরই একটা বিচিত্র হাসি হেসে বললে, 'ঠাকুর—তুমি ভাবছ আমার হাতে খেলে জাত যাবে? তুমি আগ্ করো নি বাপু, আমি একটা কথা যদি বলি—আমিও বামুনের মেয়ে!'

'য়্যাঁ!' প্রায় আর্তনাদ ক'রে উঠে কোনমতে চোখ মেলে তাকান নগেনঠাকুর। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠেও বসেন একবার।

'কী বললি?'

'হ্যাঁ গো ঠাকুরমশাই। সত্যি। আমার বাবা সুদ্দুরদের বাড়ী কখনও পা ধুতো নি।'

'আর তুই? তোর এমন দশা?' হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলেন নগেন-ঠাকুর, 'কেন রে?'

'আমি?' এবার সত্যিই ওর স্বভাব-প্রশান্ত মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'সেকথা আর শুনতে চেয়ো নি ঠাকুরমশাই। কিন্তু তুমি একটুন শুয়ে থাকো চুপ ক'রে—আমি দৌড়ে গে একটু চা নে আসি। না না—আর কথা কয়ো নি—তোমার পায়ে পড়ি, হেই ঠাকুর!'

সে সত্যিই দৌড়ে চলে গেল। কিন্তু চা নিয়ে যখন এসে পৌঁছল তখন আর নগেনঠাকুরের কোন জ্ঞানই নেই। বহু চেষ্টাতেও সে ওকে এক ফোঁটা চা খাওয়াতে পারলে না। হয়তো বা চিরকালের মতই খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ঠাকুরমশাইয়ের। কোনদিনই কিছু আর খেতে হবে না।······

তুলসীর মার কান্নাকাটিতেই পাড়ার লোকজন জড়ো হল। কে যেন একটা টেলিফোনও ক'রে দিলে য়্যাম্বুলেন্সের জন্য।

খানিকটা পরে য়্যাম্বুলেন্স এসে নগেনঠাকুরকে নিয়ে চলে যেতে পুরোনো মন্দির আবার তেমনি নিঝ্ঝুম হয়ে গেল। পাড়ার লোক

একে একে যে যার কাজে চলে গেল। নেশাখোর পাগলা বামুনের জন্যে বেশীক্ষণ নষ্ট করবে এমন অঢেল সময় কার আছে? কিন্তু গেল না তুলসীর মা। মাটির গেলাসে ক'রে চা এনেছিল ঠাকুরের জন্যে, সেটা পড়ে আছে তেমনই, ওর নিজেরও বাসিমুখে এখনও পর্যন্ত জল পড়ে নি—কিন্তু কোনদিকেই যেন ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সারাদিন তেমনি পাথরের মত বসে রইল সে মন্দিরের চাতালে—সেই য়্যাম্বুলেন্স চলে যাওয়ার রাস্তাটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে—ঠিক একভাবে।......

একেবারে যখন ওর হুঁশ হ'ল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। উঠে বাজারের দিকে যেতে ক্যাবলার চায়ের দোকান থেকে ওদের ছোকরা চাকর গৌর ডেকে বলল, 'এই তুলসের মা, চা খাবি না?'

থম্‌কে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে যেন কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলে তুলসীর মা, তারপর বললে, 'না—আজ আর চা খাবো নি!'